অক্টোবর ২০১৯, আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৬

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটির আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান

সিএসআর নীতিমালায় শিক্ষা কর্মসূচি ও মেধাবী সৃজন

জী. এম. আবুল কালাম আজাদ

সিএসআর কর্মসূচিতে সুবিধাবঞ্চিত মেধাবী শিক্ষার্থীর হাতে শিক্ষাবৃত্তি তুলে দিচ্ছেন গভর্নর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন প্রধান অতিথি মাননীয় আইনমন্ত্রী আনিসুল হক

সামাজিক দায়বদ্ধতা হলো একধরনের ব্যবসায়িক শিষ্টাচার বা নীতি যা সমাজের প্রতি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালনকে ব্যবসার নিয়মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। একটি ব্যবসা নৈতিক ও আইনগতভাবে পরিচালিত হলেই এর সমস্ত দায়মুক্তি হয়েছে তা বলা যায় না। যে পরিবেশে বা যে সমাজে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে সেই সমাজের প্রতি প্রতিষ্ঠানের কিছু দায়বদ্ধতা জন্মায়। বর্তমান যুগে অধিকাংশ বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই সিএসআর বা সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করছে এবং তাদের শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশের কিছু অংশ এই খাতে বরাদ্দ রাখছে। ১৯৬০ থেকে '৭০ দশকের দিকে পশ্চিমা বিশ্বে সামাজিক দায়বদ্ধতা শব্দটির প্রচলন ও কার্যত সমাজের কল্যাণে এ নীতিমালায় পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু হয়।

বর্তমান বিশ্বে করপোরেট সোস্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) বা সামাজিক দায়বদ্ধতার কার্যক্রম ও কলেবর দিন দিন বাড়ছে। ব্যাংকিং খাতে সিএসআর কার্যক্রম আজকের দুনিয়ায় এক অনবদ্য সৃজনশীল ও কল্যাণমূলক ব্যাংকিং বলে পরিগণিত হচ্ছে। বিশেষ করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যেহেতু সমাজের মানুষের কাছ থেকেই মুনাফা অর্জন করে, তাই মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি অবশ্যই তাদের কিছু সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে যায় বটে। এ ধারণার উপর ভিত্তি করেই ব্যাংকিং খাতে সিএসআর কার্যক্রম উৎসাহিত করার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষভাবে এ মানবিক ব্যাংকিং-এ নজর দেয়। ২০০৮ সালে সর্বপ্রথম দেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্যে সিএসআর নীতিমালা গ্রহণ করা হয়। ব্যাংকগুলোর মুনাফার একটি ক্ষুদ্র অংশও যদি সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের আওতায় দেশের পিছিয়ে পড়া বৃহত্তর জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্যে ব্যয়িত হয় তাহলে দেশ ও জাতি কিছুটা হলেও এগিয়ে যাবে।

জাতীয় উন্নয়ন চেতনা বিবেচনায় দেশের সমাজের অবহেলিত অথচ সম্ভাবনাময় খাতগুলোকে উজ্জীবিত করা এবং সকল স্তরের মানুষের জন্যে সৃজনশীল কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে একটি মানবিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ে অবহেলিত উৎপাদনমুখী খাত বিশেষ করে কৃষক, ক্ষুদে উদ্যোক্তা, নারী উদ্যোক্তা, শ্রমিক শ্রেণিসহ আর্থিক সেবাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বা আর্থিক সেবাভুক্তির আওতায় আনার উদ্যোগের সঙ্গে ব্যাংকগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতা তথা সিএসআর কার্যক্রমকে ব্যাংকিংয়ের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের দারিদ্র্য নিরসন এবং কর্মসৃজনে সহায়ক কর্মসূচিকে সামনে রেখে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, খেলাধুলা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, অবহেলিত ও অনগ্রসর এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন, মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের পরিবারের কল্যাণ ইত্যাদি খাতে যেসব সিএসআর কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তা দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সিএসআর খাতে ব্যাংকগুলোর সাম্প্রতিক কর্মযজ্ঞের কারণে চরম দরিদ্র, ভূমিহীন, ক্ষুদ্র কৃষক, বর্গাচাষি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দরিদ্র নারীসহ আর্থিক সেবাবঞ্চিত সকল শ্রেণির কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছানো সহজলভ্য হয়েছে।

সিএসআর একটি স্বপ্রণোদিত কার্যক্রম হলেও এটিকে বর্তমানে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মদক্ষতার অতিরিক্ত মাত্রা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক বিবেচনা করছে। সিএসআর কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রতিযোগিতা গড়ে তুলতে ব্যাংকগুলোর CAMELS Rating এর 'M' অর্থাৎ ম্যানেজমেন্ট রেটিং নিরূপণে সিএসআর বিষয়ক তথ্য যাচাই করা হচ্ছে যা ব্যাংকটির রেটিং-এ একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

দেশের আর্থিক খাতকে একটি মানবিক রূপ দিতে এবং জনহিতৈষী ব্যবস্থাপনা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিপালনের যেন বিকল্পই নেই। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ২০০৮ সালে এই সিএসআর খাতে ব্যাংকগুলির মোট ব্যয় ছিল ৪১.০৮ কোটি টাকা যা ২০১১ ও ২০১৫ সালে দাঁড়ায় যথাক্রমে ২১৯.০০ কোটি ও ২৫৫ কোটি টাকা। সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায় সিএসআর খাতে ব্যাংকগুলোর ব্যয় অনেক কমেছে। চলতি বছরের প্রথম ৬ মাসে ব্যাংকগুলো এখাতে ব্যয় করেছে মাত্র ২৩৯ কোটি টাকা যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ৬২৭ কোটি টাকা। পরিতাপের বিষয় হলো শিক্ষা খাতে সিএসআর ব্যয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষভাবে উৎসাহিত করলেও বিগত কয়েক বছরের মধ্যে এখাতেও ব্যয় কমতে শুরু করেছে। ২০১৫ সালে শিক্ষা খাতে ব্যাংকগুলোর যেখানে ৮১.২৬ কোটি টাকা শিক্ষা ব্যয় ছিল, ২০১৯ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে ৫৬.০৭ কোটি টাকা অর্থাৎ ৩১ শতাংশ কম। শিক্ষা খাতে সিএসআর ব্যয় সবচেয়ে বেশি ডাচ্ বাংলা ব্যাংকের যার ব্যয় ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে ৪.৮৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২৯.২৫ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এটা বিশেষ আশাব্যঞ্জক। তবে, খুব হতাশাজনক বিষয় হলো ২০১৫ সালে প্রাইম ব্যাংক ও মিডল্যান্ড ব্যাংকের শিক্ষা খাতে সিএসআর ব্যয় যেখানে ১৫.৪০ কোটি ও ৯.৭২ টাকা ছিল, ২০১৯-এ তা হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ৩.২৫ কোটি টাকা ও শূন্যে দাঁড়িয়েছে।

জ্ঞানের ভিত্তি বিনির্মাণে শিক্ষা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। এটা মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রথম সোপান; সভ্যতার মহাসড়কে উঠার পথ। এজন্যে বর্তমান সরকার জ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলা তথা মানব সম্পদ উন্নয়নকে দেশের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনে জ্ঞান, তথ্য ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে। তাই তরুণ শিক্ষার্থীদের মেধার যত্ন ও সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। তবে, দারিদ্র্য বা অর্থনৈতিক কারণে আমাদের দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে না সে হতাশা যেখানে ব্যাংকিং সিএসআর এর মাধ্যমে অনেকটাই নিরাময় হয়ে আসছিল, সেখানে সিএসআরএ ব্যাংক ইন্ডাস্ট্রির ব্যয় হ্রাস তথা শিক্ষা খাতে সিএসআর ব্যয় হ্রাস দেশের অনগ্রসর, দরিদ্র মেধাবী সৃজনে অশনিসংকেত বলে প্রতীয়মান হয়। আর্থিক কর্তৃপক্ষের নীতি ও প্রণোদনায় এমন মেধাবী সৃজন তথা কল্যাণমূলক ব্যাংকিং-এ নতুন করে আশার আলো জাগবে- সুতীব্রভাবে এ প্রত্যাশা করি।

■ *লেখক : মহাব্যবস্থাপক, ডিসিপি, প্র.কা.*

সম্পাদনা পরিষদ

- **সম্পাদক**
  জী. এম. আবুল কালাম আজাদ
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  সাঈদা খানম
  মহুয়া মহসীন
  নুরুন্নাহার
  আয়েশা-ই-ফাহমিদা খাতুন
  আজিজা বেগম
  মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
  গোলাম রাব্বী
- **গ্রাফিক্স**
  ইসাবা ফারহীন
  তারিক আজিজ
- **আলোকচিত্র**
  মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটির আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়নে আইপিএফএফ II প্রকল্প হতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি II (আইপিএফএফ II) প্রকল্পের অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্ট এর আওতায় কালিয়াকৈর, গাজীপুরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটির ৩নং ব্লকের আইসিটি অবকাঠামো নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ টেকনোসিটি লিমিটেডকে অর্থায়নের বিপরীতে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী পিএফআই ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড, ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড (বিআইএফএফএল) ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড (আইআইডিএফসি) এর অনুকূলে মার্কিন ডলার ৫.০০ মিলিয়ন এবং টাকা ৫১৪.৭৬ মিলিয়ন দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হয়। এ উপলক্ষে ফ্যাসিলিটি অ্যাকসেস্ এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও আইপিএফএফ II প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড, ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড (আইআইডিএফসি) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ টেকনোসিটি লিমিটেডের চেয়ারম্যান এবং আইপিএফএফ II প্রকল্প, বাংলাদেশ টেকনোসিটি লিমিটেড ও পিএফআইসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নে প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে বাংলাদেশ টেকনোসিটি লিমিটেড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটির ৩নং ব্লকের আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়নে আইপিএফএফ II প্রকল্প হতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান অনুষ্ঠানে গভর্নর ফজলে কবির চেক প্রদান করেন

আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতা এইচআরডি চ্যাম্পিয়ন

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার উদ্যোগে আয়োজিত আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে প্রধান কার্যালয়ের এইচআরডি। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় মতিঝিল ইউনাইটেডকে ১-০ গোলে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে এইচআরডি। ব্যাংক ক্লাব মাঠে আয়োজিত ফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস, এম, মনিরুজ্জামান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি চ্যাম্পিয়নদলসহ রানার্স আপ এবং অংশগ্রহণকারী সকল দলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি ফুটবল প্রতিযোগিতা সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় ক্লাব কর্মকর্তা, প্রতিটি দলের খেলোয়াড়, ম্যানেজার, কোচ, রেফারিসহ ফুটবলপ্রেমী দর্শকদের শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব প্রতিবছর প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য খেলাধুলা, সংস্কৃতি চর্চা ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের যেসব ব্যবস্থা করে থাকে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। ক্লাব সভাপতি মোঃ আব্দুল ওয়াদুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক ইস্কান্দর মিয়া। সহ-সভাপতি সুবোধ চন্দ্র ভৌমিকের উপস্থাপনায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহনেওয়াজ মুরাদ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন ক্লাবের বহিঃক্রীড়া সম্পাদক শিমুল কুমার ঘোষ। প্রতিযোগিতায় ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কার জিতেন মতিঝিল ইউনাইটেডের মোস্তাফিজুর রহমান। এছাড়াও ফাইনালে সেরার পুরস্কার পান এইচআরডির তৌহিদুল ইসলাম নয়ন এবং একই দলের সুব্রত সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার জিতেন, সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে মতিঝিল ইউনাইটেডের ম.মুমিনুল ইসলাম আর উদীয়মান খেলোয়াড়ের পুরস্কার পান ডিবিআই দলের ওয়াসিম খান। ১০টি দলের অংশগ্রহণে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ডিবিআই দলকে টাইব্রেকারে হারিয়ে ৩য় স্থান অর্জন করে এফইপিডি দল। এর আগে ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আহমেদ জামাল। ক্লাব সভাপতি মোঃ আব্দুল ওয়াদুদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ হুমায়ুন কবীর। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহনেওয়াজ মুরাদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর আহমেদ জামাল অংশগ্রহণকারী সকল দলকে শুভেচ্ছা জানান এবং শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিযোগিতার সমাপ্তির জন্য শুভ কামনা জানান। তিনি বলেন, শত ব্যস্ততার মাঝেও ক্লাবের উদ্যোগে এ ধরনের ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজন প্রশংসার দাবি রাখে। উদ্বোধনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, ব্যাংক ক্লাবের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ ছাড়াও দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দলের মাঝে ডেপুটি গভর্নর এস, এম, মনিরুজ্জামান

বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঞ্চয়বন্ড সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে ২৫-২৬ আগস্ট ও ২৮-২৯ আগস্ট, ২০১৯ তারিখে Guidelines on NRB Savings Bond (Wage Earner Development Bond, US Dollar Investment Bond & US Dollar Premium Bond) শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। বন্ডসমূহের নীতিমালার বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান এবং বিনিয়োগকারীদের প্রদেয় সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে ৩৮টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের সর্বমোট ৮০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণের শুরুতে বিবিটিএ'র নির্বাহী পরিচালক নূরুন নাহার প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন এবং প্রশিক্ষণের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। প্রশিক্ষণে রিসোর্স পারসন হিসেবে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শামছুন্নাহার বেগম, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের যুগ্ম-সচিব মোঃ নূরুজ্জামান, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের পরিচালক মোঃ হাবিবুর রহমান এবং ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক মোঃ খুরশীদ আলম উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের উপমহাব্যবস্থাপক রূপ রতন পাইন ও যুগ্মপরিচালক সাদরিল আহমেদ সঞ্চয়বন্ডের নীতিমালার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, বন্ডের বিক্রয় প্রক্রিয়া, সুবিধাদি, বিভিন্ন অংশীজন ও নমিনি, রেমিট্যান্স বৃদ্ধি ও বন্ডে বিনিয়োগ বাড়ানোর প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পদক্ষেপ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক মোঃ খুরশীদ আলম প্রশিক্ষণের শুরুতে উল্লেখ করেন, প্রবাসী বিনিয়োগকারীদের পর্যাপ্ত বিনিয়োগের সুবিধা/প্রয়োজনীয় তথ্যাদি না থাকার কারণে প্রেরিত রেমিট্যান্সের বিনিয়োগ কাঙ্ক্ষিত আকারে হচ্ছে না এবং রেমিট্যান্সের অর্থ পারিবারিক ভরণপোষণ ও বাসগৃহ নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে। এ বন্ডে বিনিয়োগ বার্ষিক প্রেরিত রেমিট্যান্সের প্রায় ১%। এ লক্ষ্যে সঞ্চয়বন্ডসমূহ প্রবাসীদের নিকট আরো আকর্ষণীয় ও সেবার মান অধিকতর উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থীদের চারটি গ্রুপে ভাগ করে প্রেজেন্টেশনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতি গ্রুপ হতে দুইজন প্রতিনিধিকে বন্ডের নীতিমালার অস্পষ্টতাসমূহ, বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ এবং রেমিট্যান্সের আন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে করণীয় পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে তাদের মতামত ব্যক্ত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিনিধিগণ পুনঃবিনিয়োগের ক্ষেত্রে আবেদন ব্যতিরেকে পুনঃবিনিয়োগ, পুনঃবিনিয়োগের কমিশন প্রদান, মেয়াদপূর্তির পূর্বে বন্ডের আসল বিদেশে প্রত্যাবাসন এবং বন্ড ইস্যুর সময় প্রয়োজনীয় দালিলিক প্রমাণাদি সংরক্ষণের চেকলিস্ট সরবরাহ করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া, ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সঞ্চয়বন্ড সংক্রান্ত কাজের সাথে যুক্ত থেকে সেবার মান উন্নত করার জন্য কমপক্ষে পাঁচ বছরে বদলি না করার বিষয়ে উল্লেখ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ন বক্তব্যে প্রবাসীদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয়বন্ডে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগকারীদের প্রদেয় সেবার মান অধিকতর উন্নয়নে আরো ইতিবাচক ভূমিকা রাখার ব্যাপারে প্রশিক্ষণার্থীগণ দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন এবং এরূপ প্রশিক্ষণ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে আয়োজনের দৃঢ় আশাবাদ ও দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে এবং প্রবাসীদের সঞ্চয়বন্ডে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট আন্তরিকভাবে কাজ করছে। স্বল্প আয়ের প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনার লক্ষ্যে তাদের উপার্জিত রেমিট্যান্সের অর্থ বিনিয়োগে সরকার তিন ধরনের সঞ্চয়বন্ড (ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ও ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড) প্রবর্তন করে। ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের অধীন 'এনআরবি বন্ড কমিউনিকেশন ইউনিট' টি রেমিট্যান্স আয় বৃদ্ধি এবং সঞ্চয়বন্ড বিক্রয় সহজীকরণ ও বিনিয়োগকারীদের সার্বিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কাজ করছে। বিনিয়োগকারীদের বন্ড ক্রয়ে সহায়তা বৃদ্ধি ও বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বিভাগ/জেলা শহরে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল শাখা অফিসে বার্ষিক ভিত্তিতে কর্মশালার আয়োজন, ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন প্রচার এবং প্রবাসীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন্ডের তথ্য সম্বলিত লিফলেট, প্রচার-পুস্তিকা দূতাবাসগুলোতে বিতরণের উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঞ্চয়বন্ড সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক দেয়াল ক্যালেন্ডারে আরবি তারিখ সম্পৃক্ত করার আবেদন

মুঃ গোলাম রব্বানী

বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এ ব্যাংকের বার্ষিক দেয়াল ক্যালেন্ডার অত্যন্ত জনপ্রিয়। এটি মসজিদ, মাদরাসাসহ যেকোনো ধর্মীয় মর্যাদাসম্পন্ন পরিবেশে ঝুলিয়ে রাখা যায়। কিন্তু সেই ক্যালেন্ডারে কোনো চন্দ্রমাসের তারিখ না থাকায় মুসলিম ধর্মাবলম্বী ব্যাংক কর্মকর্তাদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। মুসলমানদের নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, জন্ম-মৃত্যু-বয়স এবং চন্দ্রবর্ষ ইত্যাদি চন্দ্র মাসের তারিখ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়, অন্য কোনো দিনপঞ্জিকা মতে হয়না-এটা ইসলামি শরীয়তের বিধান। কারণ মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনে চন্দ্র মাসের আরবি তারিখ মনে রাখা বা সংরক্ষণ করা ফরজে কেফায়া (তাফসীরে আহ্কামুল কুরআন ঃ খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭৯, তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন ঃ খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৬৮ এবং তাফসীরে হেদায়েতুল কুরআন ঃ খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৮৫)।

■ *আবেদনকারী: জেডি, ডিবিআই-২, প্র.কা*

[ডিসিপি দ্রষ্টব্যঃ বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-২ কর্তৃক অনুমোদিত বাংলা ও ইংরেজি বছরের ছুটির তালিকা মোতাবেক ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স দেয়াল ক্যালেন্ডার মুদ্রণ করে।]

আরবান বিল্ডিং সেফটি প্রজেক্ট শীর্ষক প্রকল্পের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জাইকা'র অর্থায়নকৃত 'Urban Building Safety Project' শীর্ষক প্রকল্পের উদ্যোগে ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে চট্টগ্রামস্থ স্থানীয় একটি হোটেলে "Seminar on Urban Building Safety Project" শীর্ষক একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টের উপমহাব্যবস্থাপক এবং Urban Building Safety Project শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ শরাফত উল্লাহ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক আবু ফরাহ মোঃ নাছের। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হাকিম। এছাড়া, কর্মশালায় প্রকল্পের বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অংশে নিযুক্ত পরামর্শক, প্রকল্পের গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অংশের কর্মকর্তা, তৈরি পোশাকশিল্প কারখানাসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ গার্মেন্টস্ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (BGMEA), বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (BKMEA) এবং বাংলাদেশ গার্মেন্টস্ এক্সেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (BGAPMEA) এর প্রতিনিধি এবং Urban Building Safety Project প্রকল্পের পিএফআই হিসেবে তালিকাভুক্ত ৩৫টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চট্টগ্রামস্থ কর্মকর্তা ও তাদের সম্ভাব্য গ্রাহকগণ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় নির্বাহী পরিচালক তৈরি পোষাকখাতের গুরুত্ব তুলে ধরে চুক্তিবদ্ধ পিএফআইসমূহকে প্রকল্প হতে অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। প্রকল্প পরিচালক ও উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ শরাফত উল্লাহ খান Urban Building Safety Project প্রকল্পের বিভিন্ন দিক, প্রকল্পের অর্থায়নের আবেদন প্রক্রিয়া, আবেদনের আর্থিক ও কারিগরি মূল্যায়নের বিভিন্ন বিষয়সমূহ তুলে ধরেন। গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে, তালিকাভুক্ত পিএফআই কর্মকর্তা ও গ্রাহকদের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পারস্পরিক মতবিনিময় হয়। চট্টগ্রাম অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হাকিম কর্তৃক সংশ্লিষ্ট গ্রাহক এবং চুক্তিবদ্ধ পিএফআইসমূহকে প্রকল্প ইউনিট হতে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস জানিয়ে অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

উল্লেখ্য, দেশের বেসরকারি বাণিজ্যিক ভবন বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ গার্মেন্টস ভবনসমূহ সংস্কার ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে অর্থায়নের উদ্দেশ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক Urban Building Safety Project (UBSP) (BD-P84) শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাইকার অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের মাধ্যমে তৈরি পোষাক শিল্প ভবনসমূহ সংস্কার, পুনঃনির্মাণ ও প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে জাইকার ওডিএ (ODA) ঋণ সহায়তায় ৪১২৯ মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েনের সমপরিমাণ প্রায় ২৭৫ কোটি টাকার তহবিল হতে চুক্তিবদ্ধ ৩৫টি পিএফআই এর মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে স্বল্পসুদে (গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৬%) রিফাইন্যান্স/প্রিফাইন্যান্স করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মূল্যায়নের ভিত্তিতে কয়েকটি গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানকে সফলভাবে অর্থায়ন করা হয়েছে এবং আরো বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের আবেদন বিবেচনাধীন রয়েছে যেগুলোতে শীঘ্রই অর্থায়ন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে।

কর্মশালায় চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক আবু ফরাহ মোঃ নাছের বক্তব্য রাখছেন

মহাব্যবস্থাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের উপমহাব্যবস্থাপক তুলসী রঞ্জন সাহা মহাব্যবস্থাপক হিসেবে ২৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখে পদোন্নতি পেয়েছেন। তিনি ৩০ এপ্রিল ১৯৬৩ নরসিংদী জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগ থেকে বিকম (স্নাতক) এবং ১৯৮৮ সালে একই বিভাগ থেকে এমকম (স্নাতকোত্তর) সম্পন্ন করেন।

মহাব্যবস্থাপক তুলসী রঞ্জন সাহা ১৯৯৩ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ পরিদর্শন বিভাগ, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ, আইপিএফএফ প্রজেক্ট সেল, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি এবং মতিঝিল অফিসের সিকিউরিটিজ বিভাগে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। চাকরি জীবনে তিনি দেশে বিদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ সাইফুল ইসলাম খান মহাব্যবস্থাপক হিসেবে ২৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখে পদোন্নতি পেয়েছেন। তিনি ১৬ জুন ১৯৬৬ ময়মনসিংহ জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৯১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এমএ এবং পরবর্তীতে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম থেকে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৯৩ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। তিনি কৃষি ঋণ পরিদর্শন বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, ইইএফ ইউনিট, ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট এন্ড পেমেন্ট সিস্টেমস, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ এবং এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। সর্বশেষ তিনি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। চাকরি জীবনে তিনি দেশে বিদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও আলোচনা সভায় যোগদান করেছেন।

বিবিটিএ'র উদ্যোগে এক্সিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট সেমিনার

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির উদ্যোগে ২৮ আগস্ট ২০১৯ তারিখ জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে Business and Professional Ethics শীর্ষক এক্সিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর ফজলে কবির। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির নির্বাহী পরিচালক নূরুন নাহার।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য প্রফেসর মোঃ হামিদুল হক। সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর ফজলে কবির ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে অবদান রাখার জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

সেমিনারে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ মালিক কাজেমী এবং ব্যাংকিং রিফর্মস অ্যাডভাইজার এস. কে. সুর চৌধুরী। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ, বিভিন্ন বিভাগের মহাব্যবস্থাপকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

এক্সিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট সেমিনারে গভর্নর ফজলে কবির বক্তব্য রাখছেন

সহকারী পরিচালকদের ৩৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ সহকারী পরিচালক (জেনারেল) এর ৩৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি (বিবিটিএ) এর নির্বাহী পরিচালক নূরুন নাহার। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির মহাব্যবস্থাপক রোকেয়া আক্তার এবং সভাপতিত্ব করেন বিবিটিএ'র মহাব্যবস্থাপক স্বপন কুমার রায়। এছাড়া, বিবিটিএ'র অনুষদ সদস্যবৃন্দ ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ ৩৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নেয়া কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ৩৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের চিফ কোর্স কো-অর্ডিনেটর মহাব্যবস্থাপক মোঃ রুহুল আমিন। বক্তব্যে তিনি ৩৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সহকারী পরিচালকদের স্বাগত জানিয়ে কোর্স কারিকুলামের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেন। তিনি প্রশিক্ষণার্থীগণকে অফিস শৃঙ্খলা মেনে চলা এবং ক্লাসে উপস্থিতি নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির মহাব্যবস্থাপক রোকেয়া আক্তার তাঁর বক্তব্যে প্রশিক্ষণার্থীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং আচরণের উন্নয়ন ঘটানোর আহ্বান জানান। তিনি প্রশিক্ষণার্থীগণকে নিজেদের মধ্যে আন্তরিকতা বজায় রাখারও পরামর্শ দেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির নির্বাহী পরিচালক নূরুন নাহার নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠান এবং এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণের শুরু থেকেই মনোযোগী হওয়ার অনুরোধ করেন এবং শ্রদ্ধা, বিনয়, সহনশীলতা, ক্ষমা ইত্যাদি গুণাবলী অর্জনে প্রত্যেককে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বিবিটিএ'র মহাব্যবস্থাপক স্বপন কুমার রায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন ডিসিপ্লিন থেকে আগত প্রশিক্ষণার্থীদের বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা দেয়া। সেই সাথে দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অভিভাবক হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীগণ যেন ফিন্যান্সিয়াল সেক্টরে অবদান রাখতে পারে, সেভাবে তাদের প্রস্তুত করা। সেন্ট্রাল ব্যাংকার হিসেবে উপযুক্ত হয়ে ওঠার জন্য তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি এবং চিন্তা-চেতনা, আচার-ব্যবহার ও কাজের ধারায় পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে নিজেকে সমৃদ্ধ করার আহ্বান জানান।

সবশেষে, নির্বাহী পরিচালক এবং অন্য অতিথিবর্গের সাথে কোর্সে অংশগ্রহণকারী সহকারী পরিচালকবৃন্দের আনুষ্ঠানিক ফটোসেশনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য, এবার ৬৫ জন কর্মকর্তা বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশ নিচ্ছেন।

৩৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের মাঝে প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক নূরুন নাহার

রংপুর অফিস

অগ্নি নির্বাপণ মহড়া অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর অফিসে ২৮-২৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখ ফায়ার সেফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং অগ্নি নির্বাপণ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, রংপুর কর্তৃক ফায়ার সেফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং অগ্নি নির্বাপণের বিভিন্ন ধরনের কৌশল প্রদর্শন করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুরের ৪০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী উক্ত প্রশিক্ষণ এবং মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন। রংপুর অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ গোলাম হায়দার প্রশিক্ষণ এবং মহড়া অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক মোঃ জুলকার নায়েন এবং সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

সিলেট অফিস

ব্যাংক ক্লাবের ম্যাগাজিন ‘সুরমা’র মোড়ক উন্মোচন

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, সিলেটের বার্ষিক ম্যাগাজিন ‘সুরমা’ এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ব্যাংকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বিদায়ী পরিষদের সভাপতি বিনয় ভূষণ রায়ের সভাপতিত্বে ও বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলী আকতারের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ তারিকুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহাব্যবস্থাপক জীবন কৃষ্ণ রায় ও মাকসুদা বেগম। পরে আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে প্রধান অতিথি ‘সুরমা’র মোড়ক উন্মোচন করেন।

নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ তারিকুজ্জামান ‘সুরমা’র আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন করেন

সিবিএ’র আয়োজনে শোকসভা

বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (সিবিএ)’র উদ্যোগে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সন্ধ্যায় অফিসের প্রশিক্ষণ হলে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। সিবিএ’র সভাপতি মোঃ মোফাখখারুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সদস্য প্রণয় রায়ের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ তারিকুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহাব্যবস্থাপক জীবন কৃষ্ণ রায় ও মাকসুদা বেগম। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিবিএ’র কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোঃ মঞ্জুরুল হক। উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হাছিব, মোঃ দিদারুল ইসলাম, খালেদ আহমদ, শামীমা নার্গিস, মোঃ আমিনুল ইসলাম, নৃত্য রঞ্জন দত্ত পুরকায়স্থ, সঞ্জীবন মজুমদার, নীল দল সভাপতি কবির আহমদ শরীফ, সেক্রেটারি বিপ্লব চন্দ্র দত্ত, হলুদ দল সভাপতি মোঃ জাবেদ আহমদ, সেক্রেটারি সমীরণ দাশ প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে সিবিএ’র উদ্যোগে ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ রাতে সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার মিয়ারবাজারে হযরত শাহ চান্দ শাহ কালু ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসায় দোয়া মাহফিল ও গণভোজের আয়োজন করা হয়। নির্বাহী পরিচালক, মহাব্যবস্থাপকদ্বয় এবং সিবিএ নেতৃবৃন্দ দোয়া শেষে মাদ্রাসার এতিম ছাত্র ও শিক্ষকদের সাথে গণভোজে অংশ নেন।

বরিশাল অফিস

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (সিবিএ), বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন ও মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম কমান্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশালের আয়োজনে ২০ আগস্ট ২০১৯ তারিখ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা, দোয়া ও মিলাদ মাহ্ফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহ্। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল অফিসের নির্বাহী পরিচালক মনোজ কান্তি বৈরাগী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক (ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ) স্বপন কুমার দাশ ও মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও ব্যাংকিং) সমীর কুমার বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি অমল কৃষ্ণ বিশ্বাস। আলোচনা সভায় বক্তারা স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে জাতির জনকের আজীবন নিরলস সংগ্রামী ভূমিকা, স্বাধীনতা পরবর্তী দেশ পরিচালনা ও ১৫ আগস্টের কাপুরুষোচিত, নারকীয় হত্যাকাণ্ডের উপর আলোচনা করেন। সভায় জাতীয় শোক দিবসের শোককে শক্তিতে পরিণত করে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি শোষণহীন, সুখী-সমৃদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক দেশ গড়ার জন্য সকলকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের প্রয়াসে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

আলোচনা সভা শেষে ১৫ আগস্টে শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মিলাদ ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়।

রাজশাহী অফিস

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে ২২ আগস্ট ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (সিবিএ) আঞ্চলিক কমিটি, রাজশাহী ও বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহীর সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের আয়োজনে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (সিবিএ) আঞ্চলিক কমিটি, রাজশাহীর সভাপতি মোঃ আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ. এইচ. এম খায়রুজ্জামান লিটন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহীর নির্বাহী পরিচালক মনোজ কুমার বিশ্বাস ও বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (সিবিএ), প্রধান কার্যালয়, ঢাকার সাধারণ সম্পাদক মোঃ মঞ্জুরুল হক উপস্থিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেন।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন রাজশাহীর মেয়র এ. এইচ. এম খায়রুজ্জামান লিটন

স্টার্টআপ-এ নতুন দিগন্ত

সুমন চন্দ্র দাস

জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকাল বা Demographic dividend প্রত্যয়টি যখন থেকে ব্যবহার শুরু হলো তখন থেকেই মানবকে সম্পদে পরিণত করার প্রচেষ্টা বিদ্যমান। ১৫ থেকে ৬৪ বয়সের কর্মক্ষম জনগণ এই প্রত্যয়ের অংশ। আশার কথা হলো বাংলাদেশ ইতোমধ্যে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকালে রয়েছে। ২৬ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)র এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ‘বাংলাদেশ এখন তরুণ জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্র।’ এদেশের কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বর্তমানে ১০ কোটি ৫৬ লাখ, যা মোট জনসংখ্যার ৬৬%। এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের আওতায় আনা সরকারের জন্য সবচেয়ে চ্যালেঞ্জের কাজ। তাই সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি কিংবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে। বর্তমান সময়ে নিজ উদ্যোগে সমাজের কোনো সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করাকে স্টার্টআপ (Startup) বলে ধরা হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশ স্টার্টআপের জন্য সবচেয়ে ভালো সময় পার করছে। কেননা, বর্তমান তরুণ জনগোষ্ঠী এ বিষয়ে আগ্রহী। পাঠাও ডট কম, 10 minutes school এর মতো স্টার্টআপ যার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। হয়তো যাত্রা শুরু করে সব স্টার্টআপ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে না। কিংবা বাজারে টিকে থাকার সামর্থ্য অর্জন করে না। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো প্রতি ১০টি স্টার্টআপের মধ্যে নয়টির বিলুপ্তি ঘটে। তবে, যে কয়টি টিকে যায় তা আমাদের জীবন ধারায় পরিবর্তন নিয়ে আসে। এ স্টার্টআপের ফলেই আমরা পেয়েছি সবচেয়ে জনপ্রিয় সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক, সার্চ ইঞ্জিন গুগল কিংবা ইউটিউব। বাংলাদেশে এইসব মাধ্যম এতই জনপ্রিয় যে ফেসবুক ব্যবহারে বিশ্বে ঢাকা শহর দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশে জনপ্রিয় স্টার্টআপের মধ্যে হাংরিনাকি, সেবা ডট এক্সওয়াইজেড, চালডাল ডট কম, সহজ ডট কম অন্যতম। বাংলাদেশের ১৪০ মিলিয়ন জনগণ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে এবং ৮০ মিলিয়ন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী রয়েছে। এই সুযোগটিই তরুণ প্রজন্ম লুফে নিচ্ছে। তারা মূলত ইন্টানেটভিত্তিক নানা ব্যবসায় আগ্রহী হয়ে উঠছে। সেখানে সরকারি বেসরকারি প্রণোদনাও দেখা যায়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেটে তরুণ প্রজন্মকে আরো বেশি উৎসাহ দিতে স্টার্টআপের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে সরকার। শুধু তাই নয় সরকারি উদ্যোগে startupbangladesh.gov.bd নামের একটি ওয়েব এবং esdp.gov.bd বা উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প নামের অনলাইনভিত্তিক সুযোগও সৃষ্টি করা হয়েছে। ‘startupbangladesh.gov.bd’ এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে একজন ব্যক্তি তার ব্যবসায়ের ধারণা (iDEA) সাবমিট করতে পারবে। যদি সেই ধারণা সরকার কর্তৃক গৃহীত হয় তবে, সরকার অর্থায়ন করবে। উক্ত প্রকল্পের অধীনে iDEA সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলছে। এটি i-innovation Design ও Entrepreneurship Academy প্রকল্প বলে পরিচিত।

স্টার্টআপের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের ঝুঁকি থাকে। এসব ঝুঁকিকে পাশ কাটিয়ে স্টার্টআপকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হয়। ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে-

১. অর্থসংস্থানের অনিশ্চয়তা;
২. রিসোর্সের সহজলভ্যতার অনিশ্চয়তা;
৩. প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের অনিশ্চয়তা;
৪. পারস্পরিক প্রতিযোগিতা;
৫. অডিট, রেজিস্ট্রেশন, ট্যাক্স ফাইল খোলা এবং
৬. সরকারি অনুমোদন।

তবে আশার কথা হলো এই ধরনের ঝুঁকি সত্ত্বেও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সরকারের সার্বিক সহযোগিতা রয়েছে। ফলে নতুন নতুন ব্যবসায় গড়ে উঠছে। স্টার্টআপ শুরু করার পূর্বে কতগুলো বিষয় অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে-

- ধরে নিতে হবে স্টার্টআপ ফেল করবে;
- স্টার্টআপের অবশ্যই বিকল্প স্টার্টআপ রাখতে হবে;
- স্টার্টআপটি দেশের কোন এলাকার জন্য তৈরি এবং সেখানে চলমান হচ্ছে কিনা তা বিবেচনা করতে হবে;
- যতটা সম্ভব নিজের টাকায় ব্যবসা শুরু করতে হবে এবং
- স্টার্টআপ যেহেতু নিজের সন্তানের মতো, তাই এটিকে যত্ন নিতে হবে।

স্টার্টআপের এত ঝুঁকি ও সম্ভাবনার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তা স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম”(Startup Ecosystem) বলে বহুল ব্যবহৃত। এই ইকোসিস্টেমে সম্ভাবনার জন্য বাংলাদেশ সরকার অবকাঠামোগত, আর্থিক তথা বিভিন্ন কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা ও ব্যাংকগুলোর আন্তরিকতায় নতুন ব্যবসা শুরু করার ব্যাপারে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো অর্থায়ন করছে। নিজস্ব অর্থায়নের পরেই ব্যাংক স্টার্টআপে অর্থায়ন করতে আগ্রহী হয়। তখন ব্যাংক উক্ত স্টার্টআপের যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয় তা হলো-

- ব্যবসার লাইসেন্স;
- ব্যবসার চুক্তিপত্র;
- অফিস ভাড়ার চুক্তিপত্র; এবং
- গ্যারান্টরের তথ্য

এগুলো পাওয়ার পরে ব্যাংক বিনিয়োগকারীকে ঋণ প্রদান করে।

স্টার্টআপ শুরু করার জন্য মূল প্রতিবন্ধকতা হলো অর্থ। প্রাথমিক মূলধন কিংবা ব্যবসা চালিয়ে নেয়ার জন্য অর্থের যোগান করা উদ্যোক্তাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এ ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কয়েকটি উপায়-

(১) বুটস্ট্র্যাপিং বা আত্ম-অর্থসংস্থান: নিজের অর্থ কিংবা আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের থেকে নেওয়া অর্থ দিয়ে কাজ শুরু করাটাকে বুটস্ট্র্যাপিং বলা হয়।

(২) ক্রাউড ফান্ডিং: একজন উদ্যোক্তা শুরুতে তার ভাবনা একদল ব্যক্তি বা বিনিয়োগকারীর সামনে উপস্থাপন করেন। কেউ যদি আগ্রহী হন, তিনি আইডিয়াটিকে বাস্তবে রূপদান করতে টাকার যোগান দিতে পারেন। বাংলাদেশে অপরাজয় ডট কম ওআরজি (oporajoy.org) নামে একটি ক্রাউড ফান্ডিংয়ের প্ল্যাটফর্ম আছে।

(৩) এঞ্জেল ইনভেস্টরস: আইডিয়া প্রস্তুত তবে ব্যবসার শুরুর টাকা নেই এমন ক্ষেত্রে বড় অংকের টাকা বিনিয়োগে অনেকেই প্রস্তুত আছে। তাদের বলা হয় ‘এঞ্জেল ইনভেস্টর’। ৪ অক্টোবর ২০১৮ বাংলাদেশে www.bdangels.com নামে এমন একটি প্ল্যাটফর্ম শুরু হয়।

(৪) ভেঞ্চার ক্যাপিটাল: বাংলাদেশে বর্তমান ১১টির বেশি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনসহ পুরোদমে উদ্যোগের ক্ষেত্রে অর্থায়নের কাজ করে যাচ্ছে।

(৫) বিভিন্ন প্রতিযোগিতা থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত অর্থ: নতুন নতুন আইডিয়া উপস্থাপনের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে তা থেকে অর্থসংস্থান করা যায়। একজন উদ্যোক্তার জন্য এই ধরনের পুরস্কার হিসেবে পাওয়া অর্থ ব্যবসা শুরু করতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

(৬) ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান-ঋণের জন্য উদ্যোক্তার প্রথম পছন্দ হলো ব্যাংক। এসএমই ফাউন্ডেশন বর্তমানে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণ সহায়তা দিচ্ছে। ব্যাংকগুলো বাংলাদেশের নীতিমালা মেনে ঋণদান করছে। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য -

- আইডিএলসি স্টার্টআপ লোন: ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত
- বিনা জামানতে কর্মসংস্থান ব্যাংকের দুই লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ
- মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের স্মল বিজনেস লোন সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টাকা (পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন)।

সরকার, আর্থিকখাত এবং তরুণ প্রজন্মের ত্রিমাত্রিক সংযোগে ‘স্টার্টআপ’ এদেশে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তরুণ প্রজন্ম জাগ্রত বলেই দা স্পেক্টের ইনডেক্সের মতে গত দশকে GDP প্রবৃদ্ধিতে (১৮৮%) বিশ্বে বাংলাদেশ প্রথম স্থানে অবস্থান করেছে। এদেশের প্রতিটি তরুণ এখন এক একটি সম্পদ তথা সোনার মানুষ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহামান যথার্থই বলেছেন “সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ দরকার।” সেই সোনার মানুষদের হাত ধরেই ২০৩০ সালের মধ্যে SDG র লক্ষ্য পূরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের তালিকাভুক্ত হওয়ার প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সেদিন হয়ত খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন আমরা অ্যামাজন.কম, গুগল.কম কিংবা আলিবাবা.কম এর মতো কোনো বৈশ্বিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাবো এবং যার উদ্যোক্তা থাকবে এই সোনার বাংলার কোনো সোনার তরুণ।

■ *লেখক : এডি, ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট, প্র.কা.*

কারেন্সি ম্যানিপুলেশন
ফিশিং এক্সপেডিশন

প্রতিযোগিতামূলকভাবে মুদ্রা অবমূল্যায়নে প্রতিবন্ধকতা উল্টো বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা-ভিত্তিক শিল্প সংগঠন সাউদার্ন শ্রিম্প অ্যালায়েন্স; শুল্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছে। সংস্থাটি শুল্কে ভারাক্রান্ত বিদেশি প্রতিযোগী পেতে বারবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন এমনই কিছু নতুন সুযোগ উন্মোচিত হয়েছে। আমেরিকার বাণিজ্য দপ্তর মুদ্রা কারসাজিকারকদের থেকে আমদানি করার উপর শুল্কারোপের জন্য বিধি-বিধান প্রণয়নের প্রস্তাব করেছে।

অস্থিতিশীল বিনিময় হারের কারণে বিগড়ে যাওয়া আমেরিকান ব্যবসায়ীরা শীঘ্রই আরো বেশি সুযোগ পেতে পারেন। আমেরিকার ক্ষতিসাধনের জন্য যেসব দেশ কৃত্রিমভাবে তাদের মুদ্রাকে ডলারের বিপরীতে দুর্বল করে রেখেছে তাদের সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের টুইটারে কয়েক সপ্তাহব্যাপী তর্জন-গর্জনের পর আর্থিক বিশ্লেষকরা অনুমান করছেন যে, ডলারকে দুর্বল করতে আমেরিকার ট্রেজারি এক্সচেঞ্জ স্টেবিলাইজেশন ফান্ড (ইএসএফ) ব্যবহার করতে পারে। ওদিকে, ডেমোক্রেটিক দলের প্রেসিডেন্ট পদ প্রত্যাশী এলিজাবেথ ওয়ারেনও রফতানি প্রবৃদ্ধি বাড়াতে ডলারের এমন ব্যবহারের কথা বলেন। তিনি এক্ষেত্রে গবেষণা প্রতিষ্ঠান (থিংক ট্যাংক) ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল ইকনোমিক্সের গবেষক ফ্রেড বার্গেস্টেন ও জোসেফ গাগনের প্রস্তাবের উদ্ধৃতি দেন।

একদিক থেকে কথাটা অদ্ভুত শোনালেও অন্যান্য দেশের মুদ্রা অবমূল্যায়ন কারসাজি ডলার শক্তিশালী হওয়ার একমাত্র কারণ বলে মনে হয় না। যদিও গত ১৭ জুলাই প্রকাশিত আইএমএফ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ডলারের মূল্য ৬-১২% এরও বেশি অতিমূল্যায়ন করা হয়েছে। এতে এটিও বলা হয় যে, বৈদেশিক বিনিময়ে হস্তক্ষেপই সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ডলারের অতিমূল্যায়নে নীরব ভূমিকা পালন করে আসছে। আমেরিকার শিথিল রাজস্ব নীতি এবং জার্মানি এবং নেদারল্যান্ডসের মতো দেশগুলোর কঠোর অবস্থানই এমন অবস্থা সৃষ্টির জন্য মূলত দায়ী।

তবে সে যাই হোক, চলমান আমেরিকান রোষানল ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য মুদ্রা কারসাজি সংযত করতে বহুপক্ষীয় ব্যবস্থাটি সত্যিই হাস্যকর ও বাস্তবতাহীন। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ২০০৭ সালে আইএমএফ চীনকে মুদ্রা প্রতারক হিসেবে ঘোষণা করা থেকে বিরত ছিল, যদিও দেশটি তখন জিডিপির ১০% এর সমান চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত নিয়ে চলছিল এবং প্রতি ব্যবসায়িক দিনে ডলার-প্রাধান্য সম্পদে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার ক্রয় করছিল। আর তাই প্রতিযোগিতামূলক মুদ্রা অবমূল্যায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আগামীর জন্য প্রস্তুতি একেবারে মন্দ ধারণা নয়।

তবে ওয়াশিংটনের বাতাসে ভেসে বেড়ানো প্রস্তাবগুলো অপব্যবহারের ক্ষেত্রেই বেশি উপযুক্ত। এসব প্রস্তাবের মাধ্যমে আমেরিকার বাণিজ্য দপ্তর ট্রেজারি পারবে। আর যেসব কোম্পানি বিদেশি প্রতিযোগীদের উপর অন্যায় সুবিধা চাইছে তারা নিঃসন্দেহে জোরালো তদবির চালাবে। বার্গস্টেন এবং গ্যাগননের প্রস্তাবিত পদ্ধতিগুলো ট্রাম্পকে তার বাণিজ্য যুদ্ধ চালিয়ে যেতে যেকোনো পন্থা অবলম্বনের মতো বিস্তর ও বিপদজনক আর্থিক ক্ষমতা এনে দিবে। তারা মনে করেন সম ও পারস্পরিক ক্রয়সম্পন্ন দেশগুলোর মুদ্রা কারসাজি নিষ্ক্রিয়/প্রশমন করার জন্য আমেরিকার ট্রেজারিকে ইএসএফ ফান্ড ব্যবহার করতে দেয়া উচিত। এভাবেই হস্তক্ষেপকে প্রাথমিকভাবে নিরোধ করা যাবে। তবে সত্যি বলতে এটির জন্য শত শত বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। আর ট্রেজারির বর্তমান পোর্টফোলিও প্রায় ৯৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে ২৩ বিলিয়ন ডলার সংরক্ষিত রয়েছে।

তদুপরি, একতরফা পদক্ষেপ অন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকেও প্রতিশোধপরায়ণ নীতি গ্রহণে উদ্যোগী করতে পারে। ইএসএফ ফান্ড পরিচালনা করা প্রাক্তন ট্রেজারি কর্মকর্তা মার্ক সোবেল এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন- একটি মুদ্রাযুদ্ধ সংঘাত ডলারের মান আরো বাড়িয়ে দিতে পারে। কারণ বিনিয়োগকারীরা নিরাপত্তার স্বার্থে ডলার-প্রাধান্য সম্পদে বিনিয়োগের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়বে। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের কর্মকর্তা স্টিভ ইংলন্ডার আমেরিকান নীতিনির্ধারকদের সতর্ক করে বলেন- 'এমন পদক্ষেপের পরের সকালটি আপনি কেমন বোধ করতে যাচ্ছেন তা ভাবুন'। কারণ হস্তক্ষেপ মানে হলো- অজনপ্রিয় মুদ্রা ক্রয়। বার্গস্টেন এবং গাগনন যুক্তি দেখান যে, তাদের পরিকল্পনা মতে ট্রেজারির অর্থ ব্যবহার করা যাবে যেহেতু অবমূল্যায়িত মুদ্রার মান বাড়বে। কিন্তু ইউরোপীয় এবং জাপানি ঋণে নেতিবাচক ইল্ডের কারণে হওয়া ক্ষতিকে আপাতপক্ষে যতটা সম্ভব কমিয়ে আনতে হবে।

সাবধানতার আরও একটি কারণ হলো এরইমধ্যে ভঙ্গুর বহুপক্ষীয় ব্যবস্থাটির আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা। আমেরিকান পূর্ববর্তী প্রশাসনগুলো মুদ্রা কারসাজিকারক দেশগুলোর ডলার আমদানির উপর শুল্কারোপের কথা চিন্তা করত। তারা এসময় যুক্তি দেখিয়েছিল যে, কৃত্রিমভাবে দুর্বল বিনিময় হার তাদের রপ্তানি ভর্তুকির পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু পরে তারা এই ভেবে পিছু হটে যে, এটি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়মনীতির পরিপন্থী। আর একটি পরস্পর বিপরীতমুখী পদক্ষেপে অনেক আইনি চ্যালেঞ্জ আসবে; খুব সম্ভবত তা প্রতিশোধমূলক শুল্কারোপকে আরো উস্কে দেবে। তবে যুদ্ধংদেহী ট্রাম্পের অবশ্য এই বিষয়টি মাথায় আছে বলে মনে হয়না।

■ *Currency Manipulation; Fishing Expedition*
দ্য ইকোনোমিস্ট, ২৭ জুলাই - ০২ আগস্ট, ২০১৯ সংখ্যা
অনুবাদ: মোহাম্মদ মিজানুর রহমান (জেডি) চিফ ইকোনোমিস্টস ইউনিট ও গোলাম রাব্বী (অফিসার), ডিসিপি, প্র.কা.।

মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি লাভ

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের উপমহাব্যবস্থাপক বিষ্ণু পদ বিশ্বাস ২৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন। তিনি যশোর জেলার বাঘার পাড়া উপজেলার রাঘবপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৯৯২ সালের ২৪ মার্চ বাংলাদেশ ব্যাংকে সরাসরি সহকারী পরিচালক হিসেবে গবেষণা বিভাগে যোগদান করেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কনফারেন্সে যোগদানের উদ্দেশ্যে সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকা, কোরিয়া, জার্মানি প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। বিভিন্ন রেফার্ড জার্নালে দেশের অর্থনীতির উপর তার একাধিক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

পেশা হয়ে উঠুক নেশা

এন এ এম সারওয়ারে আখতার

গত ১১ সেপ্টেম্বর ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকে আমার ও আমার ব্যাচমেটদের চাকরির অষ্টম বর্ষপূর্তি। এই আট বছর আর সেই সাথে পূর্বের প্রায় চার বছরের চাকরির অভিজ্ঞতায় খুব বড় মাপের কোনো স্বীকৃতি বা ক্ষমতা অর্জন না করলেও, শিক্ষা কিছুটা হয়েছে; সুযোগ পেয়েছি অনেক নিবেদিত প্রাণ কর্মকর্তার সান্নিধ্যে কাজ করার। বেশ ক'বছর পরিক্রমার প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সাক্ষাৎকার নিয়েছি কয়েকজন প্রবীণ কর্মকর্তা-কর্মচারীর। নিজ প্রতিষ্ঠানের বাইরেও মেশার সুযোগ হয়েছে নানান পেশা আর মতের মানুষের সাথে। সেইসব শিক্ষা আর একযুগের সরকারি চাকরির অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে, সরকারি চাকরি মানেই স্টেরিওটাইপ কিছু দায়িত্ব আর ছা-পোষা জীবনযাপন নয়। স্বপ্ন আর সদিচ্ছা থাকলে এখানেও আছে কাজ করার অনেক সুযোগ। তবে সে জন্যে পেশাটা নেশা হয়ে উঠতে হবে। সে ভাবনাগুলোই, বিশেষ করে গত ২/১ বছরে যোগদানকারী নবীন প্রজন্মকে উদ্দেশ্য করে আমার এ লেখনীর ক্ষুদ্র প্রয়াস।

বলছিলাম পেশার নেশা হয়ে উঠার কথা। পেশা কখনো নেশা হতে পারে কি না এ নিয়ে দ্বিমুখী বিতর্ক বিরাজমান। তবে এটি সুনিশ্চিত যে, কেবল উপার্জনের জন্য কাজ করতে গেলে একঘেঁয়েমি আসবেই। তা সে গবেষণা হোক, কিংবা বেচা-কেনা। শ্রম ব্যবস্থাপনা আর আচরণবিদ্যা নিয়ে যারা কাজ করেন তারা নিয়োগকর্তার জন্য যেমন প্রেসক্রিপশন দেন সুন্দর নিরাপদ আর চিত্তাকর্ষক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার, তেমনি কর্মীদের জন্য প্রস্তাব রাখেন- প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে কাজ করার। শ্রম আইন কর্মীর অধিকার বা প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে বটে, তাই বলে কর্তব্য পালন থেকে ব্যক্তিকে অব্যাহতি প্রদান করে না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কর্মস্থলে অধিকার সচেতন অনেকেই প্রথম অংশটি নিয়ে খুব তৎপর থাকলেও দ্বিতীয়াংশের কথা বেমালুম ভুলে যান। তখনই প্রতিষ্ঠানের ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে, কর্মকুশলতা হ্রাস পায়, পড়ে যায় সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা।

সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা হ্রাসের অবশ্য আরও অনেক কারণ থাকতে পারে। প্রতিষ্ঠানে সুশাসন ও শুদ্ধাচার কতটা তাত্ত্বিক আর কতটা প্রায়োগিকভাবে উপস্থিত রয়েছে, যে ম্যান্ডেট নিয়ে প্রতিষ্ঠান কাজ করার কথা তা কতখানি করছে আর কতখানি গোষ্ঠীস্বার্থ সংরক্ষণ করছে তাতেও সমাজে-প্রতিবেশে তার একটা মূল্যায়ন হয়েই যায়।

তেমনি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ডিং। এই ব্র্যান্ডিংটা প্রতিষ্ঠানের হলেও, তা ঘটে কিন্তু ব্যক্তি পর্যায়ের আচার-আচরণ আর ধ্যান ধারণার মাধ্যমেই; ঠিক যেমন একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি তার ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য পণ্যের প্যাকেজিং বা সেবার অ্যাডভার্টাইজিং থেকে শুরু করে সিএসআর-এর আড়ালে স্পন্সর করে, ওয়েবসাইটটা করে সহজে নেভিগেবল। মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট আর পাবলিক সেন্টিমেন্টের প্রতি রি-অ্যাকশনগুলো যে প্রতিষ্ঠান যততো কৌশলে আর ক্যালকুলেটিভ উপায়ে করে, সে প্রতিষ্ঠান ততটাই মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে যায়।

নিভৃতচারী সেবাদাস হয়ে এখনকার সামাজিক যোগাযোগের যুগে সমাজে কোনো প্রতিষ্ঠানের অবস্থান গড়ে তোলা তাই কেবল কঠিন নয়, খানিকটা অলীক কল্পনাও বটে। আত্মপ্রচারণা বরাবরই নিন্দনীয় এবং বিরক্তিকর বটে, কিন্তু আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নিজের কাজ আর অবস্থানটা সামাজিক ইকো সিস্টেমের অন্যদের জানান দেয়াটা দূষণীয় নয় বোধ করি। এ কারণেই এয়ারপোর্টে বড় চালান ধরলে কাস্টমস কর্তারা সংবাদ সম্মেলন করে জানান দেন, প্রতিটা ক্রিকেট ম্যাচের আগে ক্রিকেট দলগুলো নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং করেন, জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধির আগে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আয়োজন করেন গণশুনানির। জনসম্পৃক্ততা বাড়াতেই কর বিভাগ বছর বছর আয়োজন করে আয়কর মেলা, পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স, কৃষি বিভাগ, মৎস্য বিভাগ, সমবায় অধিদপ্তর বা এরকম আরও অনেকে ভিন্ন ভিন্ন নামে বা আঙ্গিকে আয়োজন করে নাগরিক সেবাসপ্তাহ। এর বাইরেও প্রতিষ্ঠানগুলো হয় নিজেরা সামাজিক সম্পৃক্ততা বাড়াচ্ছে নয় এধরনের কাজে তাদের কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করছে নিয়ত।

এক্ষেত্রে 'কৃষি বায়োস্কোপের' কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি একটা ইউটিউব চ্যানেল। চুয়াডাঙ্গার একজন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা চ্যানেলটি চালান। তার সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা এরই মাঝে দু'লাখ বাইশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে, ভিউয়ার ২৪ কোটি। অনেক মানুষ উপকৃত হচ্ছেন তার এই চ্যানেল থেকে। সম্প্রতি আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রশংসিত হয়েছে এ চ্যানেলটি। এটি না করলে যে তিনি বেতন পেতেন না কিংবা তার পদোন্নতি হতো না, তা কিন্তু নয়; তিনি এটা করেছেন তার কাজের প্রতি ভালোবাসা থেকে। এটাই হচ্ছে পেশাকে নেশা হিসেবে বেছে নেবার একটা উদাহরণ। শুক্র শনিবারে ছুটির দিনে কৃষকের কাছে কাছে গিয়ে এ ভদ্রলোক কিন্তু কোনো ওভারটাইম পান না, পান জনসেবার সন্তুষ্টি। আর প্রতিষ্ঠান তাকে যেটা দেয় সেটা হলো, মাঠ পর্যায়ের যোগ্য কর্মকর্তা হিসাবে পুরস্কার-সম্মাননা; কৃষি বায়োস্কোপ নিয়ে কাজ করবার জন্য স্বাধীনতা।

বাংলাদেশ বেতারের এক কর্মকর্তাকে চিনি, যিনি কাজ করেন ইউনিসেফ বা একশন এইডের সাথে। কেউ তাকে বলে দেয় না, প্রাণের তাগিদে তিনি অনুষ্ঠান বানান কিশোর-কিশোরীদের সমস্যা-সম্ভাবনা নিয়ে। তিনিও জানেন 'রেডিও আজকাল খুব কম মানুষ শোনে'; তবু খুব কাছে থেকে দেখেছি, তার অনুষ্ঠান শুনে উদ্বুদ্ধ হয়ে কোনো স্কুলছাত্রী যখন তার বান্ধবীর বাল্যবিয়ে ঠেকাতে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ছুটে যায় উপজেলা প্রশাসনের কাছে; বিভাগীয় কমিশনার, প্রশাসন, বেতারের ঐ কর্মকর্তা, প্রত্যেকেরই চোখে মুখে সাফল্য আর তৃপ্তির ছবি ফুটে ওঠে।

শুধু বাইরের প্রতিষ্ঠানের কথাই বা কেন বলছি, আমাদের সিআইপিসি (১৬২৩৬), ওয়েব সাইট, এসএমই ব্যাংকিং মেলা- এগুলোও তো জনসম্পৃক্ততা বাড়াবারই অংশ মনে হয় আমার কাছে। আমরা হয়তো অনেকেই জানি, অফিসিয়াল একটি ফেসবুক পেজও রয়েছে আমাদের। অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট, ফাইন্যান্সিয়াল সেন্সিটিভ ইস্যু ইত্যাদি কারণে আমাদের হয়তো অন্যদের মতো করে কথা বলার সুযোগ নেই, কিন্তু প্রতিষ্ঠান নিয়ে মানুষ যদি ভুল ধারণা পোষণ করে কিংবা বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো সেবা নিয়ে কেউ কিছু জানতে চায়, তাহলে সঠিক তথ্যটা যদি দিতে পারি (যেমন- কোনো কাজে কোনো বিভাগে যেতে হবে, বেসিক সার্কুলারটা কি ইত্যাদি) তাতেও একটা ব্র্যান্ডিং হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ কি, বিশ্বের আর দশটা কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিভাবে দায়িত্ব সম্পাদন করে এসব নিয়ে আপডেট থাকাটা কিন্তু আমাদেরই উপকারে আসবে। অবশ্য ছকে বাঁধা কাজের বাইরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে কাজ করবে না তা আধুনিক ডেভেলপমেন্টাল সেন্ট্রাল ব্যাংকিংয়ের ধারণা সমর্থন করে না। বিশ্বব্যাপী

ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন নিয়ে আলোচনার টেবিলে সেন্ট্রাল ব্যাংকের ভূমিকা নিয়ে যখন আলাপ হয় তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের নাম অনেকেই উচ্চারণ করেন বলে শুনেছি, অথচ ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজ করা উচিত কিনা এ নিয়ে যে সমালোচনা ছিল না, তা কিন্তু নয়। দেশ, জাতি, সমাজ আর প্রয়োজনভেদে নির্ধারিত হয় সেন্ট্রাল ব্যাংক কি কাজ করবে, সেটা ম্যানেজমেন্টের বিচার্য বিষয়। তা নিয়ে অভিমত ব্যক্ত করার অধিকার আমরা যারা 'চাকুরে', তাদের নেই। না থাকাটাই স্বাভাবিক।

সাম্প্রতিক সময়ে আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রো অ্যাক্টিভ হয়ে উঠছে, নিজেদের উপস্থাপন করছে নানা পন্থায় আর মাধ্যমে। যেমন ধরুন, রেলওয়ের রয়েছে নিজস্ব ফ্যান গ্রুপ পেজ। সেখানে গ্রাহকের অভিযোগের ভিত্তিতে রেলওয়ে সাম্প্রতিক সময়ে তাদের সেবায় কিছু পরিবর্তন এনেছে। সরকারি অনেক দফতর-ই এখন ব্যবহার করছে হটলাইন নম্বর যেখানে ফোন করে অনেকেই সেবা পাচ্ছেন। রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমও স্টুডিওর বাইরে মাঠে ময়দানে গিয়ে মানুষের কথা তুলে আনছে, প্রচার করছে নানা ধরনের সরাসরি ফোন ইন অনুষ্ঠান। ডাক বিভাগের 'নগদ' সেবা নিয়ে রেগুলেশনের প্রশ্নে আমাদের অনেকের মনে খটকা লাগলেও অস্বীকার করার উপায় নেই সেবাটি তাদের অস্তিত্ব আর জনসম্পৃক্ততার প্রশ্নে একটি উদ্ভাবনী চিন্তা (বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যবহার যেভাবে বেড়ে চলেছে, কিংবা ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমে প্রতিনিয়ত যেসব পরিবর্তন আসছে তাতে অস্তিত্ব রক্ষায় বিশ্বের তাবৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংকারদেরও যে উদ্ভাবনী চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে না তা বলা যায় না)।

ভাইভা বোর্ডে আলুথালু বেশে কেউ হাজির হলে প্রথম দর্শনেই যেমন তার প্রতি একটা বিরূপ ধারণা জন্মে বোর্ডের, যত যোগ্য আর কর্মদক্ষই সে হোক না কেন, তেমনি যদি প্রতিষ্ঠানের পরিচয় বহনকারী ফ্যাক্টরগুলো যেনতেন রকমের হয়, বাইরের মানুষ তাকে হেয়ভাবে দেখবে এটাই স্বাভাবিক। প্রতিদিন আমরা যে কেস কভারে মুড়ে শত শত কেস আমাদের উর্ধ্বতনবৃন্দের নিকট উপস্থাপন করি, সেই কেস কভার যদি ছেঁড়াফাটা হয়, কিংবা কলম পেন্সিলে তার উপরে অনেক আঁকিবুঁকি থাকে, আমাদের বস-রা কিন্তু বিরক্ত হন। কেসের রেফারেন্সগুলো সঠিকভাবে ফ্ল্যাগিং/ রেফারেন্সিং না করলে তা শুধু বিরক্তির উদ্রেক করে না, অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করে। প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীর গ্রহণযোগ্যতাও ঠিক একইভাবে সমাজে মূল্যায়িত হয় তার পরিচিতির উপকরণগুলো দিয়ে। দেশের নানা স্থানে অনেক রেস্ট হাউজ, গেস্ট হাউজ আছে, কিন্তু সার্কিট হাউজগুলো দেখবেন ইউনিক। কারণ- ব্র্যান্ডিং। ঠিক যেমন অ্যাম্বুলেন্স বা ফায়ার সার্ভিসের ব্র্যান্ডিং হয় তাদের মাইক্রোবাসগুলোর মাথায় নীল-লাল আলোর আর নির্দিষ্ট প্যাটার্নের ভেঁপুর সমন্বয়ে।

প্রথম প্যারাতেই উল্লেখ করেছিলাম কর্মপরিবেশের কথা। গত আট বছরের কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং ক্যারিয়ারে দেখেছি মাসিক কর্মপরিবেশ সভাকে বেশ গুরুত্ব দেয়া হয় অফিসে। সে সূত্রেই একটু বলতে চাই, আমরা খুবই সৌভাগ্যবান যে আমাদের অনেক অফিসেই ছোট আকারে হলেও লাইব্রেরি আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কাজ করবো কিন্তু জ্ঞানচর্চা করবো না তাহলে কিভাবে নতুন কিছু করবো? কিভাবে যুগোপযোগী পলিসি আসবে? কিভাবে প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী হবে? অনেকে ভাবতে পারেন, পলিসি ইস্যুতে শাখা অফিসগুলোর কি করণীয়? আমাদের যে কাজের ধারা, দৃশ্যমান কিছু হয়তো তাতে নেই, কিন্তু ইনপুটগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও আসার সুযোগ রয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক নীতি/প্রবিধি, এসএমই নীতিমালা, কৃষি ঋণ নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে শাখাগুলোর তথ্য যে কদাচিৎও কাজে দেয়নি তা বলার সুযোগ সম্ভবত নেই, সংশ্লিষ্টরা ভালো বলতে পারবেন।

যেকোনো বিষয়ে ইনপুট দিতে গেলে ডেস্কের বাইরেও জানার সুযোগ থাকতে হয়। আমাদের সে সুযোগটা রয়েছে। শুধু লাইব্রেরি না, ইন্ট্রানেটের নিউজ ক্লিপিংটাই বা কম কি? তবে হ্যাঁ, সীমাবদ্ধতা যে নেই তা নয়। অনেক নবীন সহকর্মী টেবিলে কম্পিউটার না থাকায় শেয়ারিং (আমার এক ভুটানি সহপাঠী বলত- শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং!) করে কাজ করছেন। তো একজন যখন কাজ করছেন, অন্যজন তখন চুপচাপ বসে না থেকে একটা গাইড লাইন কিংবা একটা পত্রিকা পড়তে পারেন। এখনো উপস্থাপন করা হয়নি, এমন কোনো কেস নিয়ে একটু নেড়েচেড়ে দেখতে পারেন। এমনকি সময় থাকলে সিনিয়রদের সহায়তায় পুরাতন রেফারেন্স কেস বের করে / গোপনীয় না হলে পুরাতন অডিট আপত্তির ফাইল বের করে নেড়েচেড়ে দেখলেও সমৃদ্ধ হবেন।

প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতির কারণে, যত সহজে বলছি, তত সহজে হয়তো কাজটা করা যায় না, কিন্তু চেষ্টা করতে দোষ কি? এই যেমন শাখা অফিসে মাঝে মাঝে দুপুরের দিকে 'ভেরিফিকেশন ইউনিট' থেকে সারপ্রাইজ হয় 'আপনি সিটে আছেন কিনা সেটা দেখতে'। না থাকলে অডিটের খাতায় নামও উঠে যায়। অথচ হতেই পারে যে, ঐ সময় আপনি হয়তো ছিলেন লাইব্রেরিতে। আবার এও ঠিক, অফিসের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যেই ১৯৬৬ সালে বা তারও পূর্বে অনেক ভেবেচিন্তে এসব প্র্যাকটিস অগ্রজরা শুরু করেছিলেন, যেটি স্বাধীনতার পরেও বলবৎ রাখা হয়েছে।

এবারে আসে ব্যক্তিগত দায়বোধের কথা। কেবল প্রতিষ্ঠান সুন্দর নিরাপদ আর চিত্তাকর্ষক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করবে তা নয়, কর্মীদেরও হতে হবে প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়বদ্ধ। বিদ্যুতের অপচয় হচ্ছে কিনা, বিভিন্ন শাখা/উপশাখায় 'পদ্ধতি মোতাবেক' কাজ হচ্ছে কিনা, সবাই আইডি কার্ড পরেছে কিনা, পোশাক-ভাতা যারা পান তারা ঠিকঠাক পোশাক পরে অফিসে এসেছেন কিনা এসব নিয়ে শাখা অফিসগুলোতে প্রথম শ্রেণির (নবম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের) কর্মকর্তারা মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের প্রতিনিধি হিসাবে 'সারপ্রাইজ' ভিজিটে বের হন এবং সত্যটা লিখে অনেকের বিষোদগারের পাত্র/পাত্রীতে পরিণতও হন অনেক সময়। অথচ প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়বদ্ধতার চর্চা আমাদের সবার মাঝে থাকলে হয়তো এসব সারপ্রাইজের প্রয়োজনই হতো না। যেমন ধরুন, সিট ছেড়ে উঠে যাচ্ছি, নিজের টেবিলের ফ্যানটা, লাইটটা নিভিয়ে গেলাম; আইডি কার্ডটা পরে অফিসে এলাম, পোশাকের নামে যে টাকা নিয়েছি, সেটা দিয়ে পোশাক-ই বানালাম; প্রাপ্যতা অনুযায়ী তৈজসপত্র কিনে নিতে ডেডস্টক আমাকে যে টাকা দিয়েছে তা দিয়ে তৈজসপত্রই কিনলাম, ছুটির দিনেও কর্মস্থল ত্যাগ করতে গেলে স্টেশন লিভ অনুমোদন নিয়ে গেলাম কিংবা সাময়িক ব্যক্তিগত কাজে বাইরে গেলে অনলাইন মুভ আউট লগে লিখে গেলাম (অনেকে মুভমেন্ট রেজিস্ট্রারেও লেখার কথা বলেন। অবশ্য রেজিস্ট্রারগুলোতে যে পদের কর্মীদের লেখার কথা, তার চেয়ে উপরের পদের কর্মীরা লিখবেন কিনা এবং লিখলে সেটা পদের অমর্যাদা হবে কিনা, সেটা ভিন্ন আলোচনার বিষয়)। এগুলোও কিন্তু প্রতিষ্ঠানের প্রতি এক ধরনের দায়বদ্ধতা। শুদ্ধাচার নীতিমালারও আওতায় পড়ে এসব আচরণ।

একইভাবে 'পদ্ধতি মোতাবেক' কাজ নিশ্চিত করার জন্য প্রযোজ্য ম্যানুয়ালগুলো নিজ উদ্যোগে পড়াটাও আমাদের, বিশেষ করে নবীন যোগদানকারী কিংবা পদোন্নতি পেয়ে অফিসার/এডি হওয়া কর্মীদের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। এসব না করলে যে আপনার বেতন কাটা যাবে বা পদোন্নতি হবে না তা নয়; কিন্তু করলে কাজটা নিখুঁত হবে। বিপদে পড়ার আশংকা কমবে। অনেক সময় 'লেট সিটিং' নামের এক বিশেষ সুবিধা আমরা ভোগ করি, সুবিধা না পেলে খানিকটা মনক্ষুণ্ণও হই অনেকে। লেট আওয়ারে ডেস্কের কাজ শেষ হয়ে গেলে, আমরা কিন্তু একটু একটু করে এ পলিসিগুলো পড়তে পারি।

আমরা আরেকটি দিক দিয়ে সৌভাগ্যবান, পদোন্নতি পেতে আমাদের কোনো পরীক্ষা (ব্যাংকিং ডিপ্লোমা ভিন্ন ইস্যু) দিতে হয় না (অনেক প্রতিষ্ঠানেই এ সুযোগটা নেই। পরীক্ষা দিয়ে ফিটলিস্টে নাম লিখিয়ে তবেই পদোন্নতি পেতে হয়), সারা বছরের কর্মফল তথা বসের সন্তুষ্টিই আমাদের পদোন্নতির নিয়ামক। কিন্তু আপাতদৃষ্টে দরকার না থাকলেও নিজেকে উচ্চপদের জন্য যোগ্য করে তুলতে আমাদের উচিত পলিসি জানা এবং জুনিয়রদের উৎসাহিত করা। অথচ, আমরা অনেকেই তা করতে নারাজ বা অনাগ্রহী।

অফিসার/এডি নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতিমুক্ত থাকার সুনাম রয়েছে আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠানের। যোগদান পরবর্তী পোস্টিং, ট্রেনিং ইত্যাদি ক্ষেত্রেও অফিসকে অফিসের গতিতে চলতে দেয়া, কোনোভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা না করা- সেটাও কিন্তু এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা। এই দায়বদ্ধতাগুলো নিয়ে যখন আমরা কাজ করবো, তখন পেশাটাও আস্তে আস্তে নেশা হয়ে উঠবে আমাদের কাছে। আর তখনই আসবে কাজের গুণগত পরিবর্তন। গৎবাঁধা নোটিং লেখা আর ১০টা - ৬টা সিটে বসে থাকাতেই নিজের দায়িত্বকে সীমাবদ্ধ না করে, অফিসের কাজকে নিজের কাজ ভেবে করে যাওয়াটার মাঝেই মিলবে পেশাগত প্রশান্তি।

■ *লেখক: ডিডি, খুলনা অফিস*

মানুষ, উন্নয়ন ও সবুজ প্রবৃদ্ধি

শিশির রেজা

> বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষিক্ষেত্রে, বিশেষ করে মশলা ফসল উৎপাদন ও গবাদি পশু পালনের ভর্তুকি ঋণের সহায়তা নিশ্চিত করে নয়া মডেল সৃষ্টি করেছে। মডেলটি সবুজ উদ্যোক্তাদের জন্যেও অনুসরণীয় হতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক, সবুজ আর্থিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে প্রবর্তন করেছে সিএসআর। বর্তমানে সিএসআর এর ১০ শতাংশ ব্যয়িত হচ্ছে সবুজ অর্থায়নের উদ্যোগ বাস্তবায়নের কাজে।

পৃথিবীর সাম্প্রতিক সামষ্টিক দুর্বল অর্থনীতি এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন জীবকূলকে হুমকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। শিল্পবিপ্লবের পর থেকে পৃথিবীর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং তার অনিবার্য পরিণতি গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন বৈশ্বিক পরিবেশকে শঙ্কিত করে তুলছে। একজন মানুষের যে পরিমাণ ভার বহন করার ক্ষমতা আছে, তাকে যদি তার ক্ষমতার ৩০% ভাগ বেশি বহন করতে দেয়া হয়, তাহলে যে পরিস্থিতি তৈরি হবে, বর্তমান পৃথিবীকেও তার ক্ষমতার থেকে অধিক ভার বহন করতে দিয়ে একই রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছি আমরা।

সবুজ প্রবৃদ্ধি এলে উন্নয়ন হবে, কর্মসংস্থান হবে, দারিদ্র্য দূর হবে। বনবাদাড় উজাড় হবে না। নদী-নালা, খাল-বিল ভরাট হবে না, দখল হবে না। কলকারখানা দূষণ ছড়াবে না। কার্বন নিঃসরণ বাড়বে না। পরিবেশ দূষিত হবে না। প্রতিবেশ বিনষ্ট হবে না। বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ হলেও গত দুই দশক ধরে জিডিপির একটি উন্নয়নশীল ধারা বজায় রেখেছে, যা প্রশংসার দাবিদার। পৃথিবীর উন্নয়নের ইতিহাস বলে, কোনো উন্নয়নশীল দেশ যখন দ্রুত জিডিপির অগ্রগতি অর্জন করে, তখন একটা পর্যায় পর্যন্ত উন্নয়ন কর্মকান্ডগুলো পরিবেশের সুস্থতার কথা ভাবার ফুরসত পায় না। পরিবেশের সুস্থতা বজায় রেখে উন্নয়ন করার বিষয়টি তখন গৌণ হয়ে যায়। উন্নয়ন ইতিহাস থেকে আমরা এও জানি যে, জিডিপি উন্নয়নের একটি পর্যায়ে একটি দেশের মোড় ঘুরতে থাকে অর্থনীতির অদৃশ্য শক্তির কারণেই। আর তখন পরিবেশের কথা সবাই ভাবতে বাধ্য হয়।

দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতিতে পরিবেশের সুস্থতাকে সংশ্লিষ্ট না করে আমরা যদি টেকসই উন্নয়ন নিয়ে ব্যস্ত থাকি তবে, আমাদের পরিবেশের সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে; আমরা আমাদের পরবর্তী বংশধরদের জন্য কিছুই রেখে যেতে পারবো না। ইতোমধ্যেই, বনধ্বংস, জীববৈচিত্র্য ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, পানি ও মাটি দূষণ, বর্জ্য অপসারণে সমস্যা, খাদ্যে নিরাপত্তাহীনতা এবং সামাজিক অসমতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি দেশ। এখনই যথেষ্ট সচেতন না হলে বাংলাদেশে পরিবেশের বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। এর থেকে বাঁচার জন্য 'সবুজ অর্থনীতি'তে প্রবেশ করা ছাড়া বাংলাদেশের আর কোনো উপায় নেই। গবেষণায় দেখা গেছে, সবুজ অর্থনীতিতে খুব দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। এই অর্থনীতি দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করে এবং শক্তি ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহারকে নিশ্চিত করে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের যে দুর্যোগ আমাদের দেশে ধেয়ে আসছে এবং তার বিধ্বংসী প্রভাব কাটিয়ে উঠার জন্য আমরা পৃথিবীর উন্নত দেশে যে ক্ষতিপূরণের ডাক দিয়েছি, সেটা অবশ্যই আমরা চাই। এখনই আমাদের যা দরকার তা হচ্ছে, বাংলাদেশে সবুজ অর্থনীতি বিনির্মাণের জন্য সম্ভাব্য স্থানগুলোকে চিহ্নিত করে বিনিয়োগের ডাক দিতে হবে সর্বতোভাবে।

সবুজ প্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত কাজে ব্যাংকের অপরাপর গ্রাহক কে কী করছেন এ বিষয়ে ব্যাংক তার গ্রাহকদের তথ্যসেবা দিয়ে অবহিত ও অনুপ্রাণিত করতে পারে। সবুজ উদ্যোগে অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য-জ্ঞান বিনিময়ের কাজও করতে পারে ব্যাংক। সবুজ প্রবৃদ্ধি অর্জনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের সক্ষমতা জোরদারে কাজ করতে পারে। যেমন- পুনঃঅর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি করা। মানবিক চেতনার মধ্য দিয়ে আর্থিক ক্ষেত্রকে সবুজ অর্থায়নে আগ্রহী করে তোলার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সবুজ প্রবৃদ্ধির জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক যথাযথ কাজ করছে কি না সেসব তথ্যের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকি ব্যবস্থা কার্যকর করার প্রয়োজন রয়েছে। তবে পুঁজিবাজার ও বীমা বাজারও সবুজ অর্থায়নের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে পারে। উন্নত বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকি নিরসনের লক্ষ্য নিয়ে পুঁজিবাজার ও বীমা বাজারের তথ্য প্রকাশ ও প্রণোদনা প্রদানে বড় মাপের সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উন্নয়নমূলক ভূমিকার কারণে সবুজ অর্থায়নে বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে গৌরবময় আসনে স্থান করে নিয়েছে। এই অভিযাত্রাকে টেকসই করার স্বার্থেই বাংলাদেশ ব্যাংককে সচেতন ও সক্রিয় থাকতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্যোক্তাদের সবুজ পণ্য উৎপাদনের পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি চালু করেছে। ২০১২ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়নে প্রায় দ্বিগুণ মূলধন (৪৭৮ মিলিয়ন টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯২০ মিলিয়ন টাকা) জোগান দিয়েছে। এই উদ্যোগের আওতায়

বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়নের মাধ্যমে পারিবারিক সৌরবিদ্যুৎ, জৈব জ্বালানি ও বায়োগ্যাস এবং কৃষিক্ষেত্রে গবাদি পশু পালনের ভর্তুকি ঋণের সহায়তা নিশ্চিত করেছে

সর্বোচ্চ পরিমাণে ঋণ গ্রহণকারী ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে পরিবেশবান্ধব ইটের ভাটা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি। এ জন্য পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা তৈরি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এই নীতিমালার মাধ্যমে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বিষাক্ত কার্বন মনো-অক্সাইড উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত উদ্যোক্তাদের অর্থ জোগানের ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করে সেসব কাটিয়ে ওঠার জন্য সবুজ অর্থায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এজন্য ঋণ প্রস্তাবনার শুরুতে উদ্যোক্তার পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতির বিষয় খতিয়ে দেখার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। পাশাপাশি সবুজ বিনিয়োগ বা সবুজ অর্থায়নের উদ্যোগকে দৃঢ় সমর্থন দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। পুনঃঅর্থায়নের মাধ্যমে পরিচালিত সবুজ প্রকল্পগুলো হচ্ছে পারিবারিক সৌরবিদ্যুৎ, সৌর বিদ্যুতের ক্ষুদ্র কেন্দ্র স্থাপন, সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন, সৌর বিদ্যুতের প্যানেল সংযোজন, জৈব জ্বালানি ও বায়োগ্যাস। ইটভাটায় পরিবেশ দূষণকারী কাঠ ব্যবহার বা পরিবেশ বিধ্বংসী ইট পোড়ানোর পরিবর্তে জ্বালানিসাশ্রয়ী বিকল্প উপায়ে ইট পোড়ানো, জৈব সার উৎপাদন, ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, পুরনো প্লাস্টিক বোতল পুনঃব্যবহার, সৌরবিদ্যুতের ব্যাটারি রিসাইক্লিং, লাইট ইমিটেটিং ডায়োড বা এলইডি বাতি, এলইডি মনিটর উৎপাদন এবং সবুজ গার্মেন্টস কারখানার মতো নানামুখী অর্ধশতাধিক সবুজ পণ্যের বিনিয়োগের উদ্যোগ কার্যকর করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। অর্থনীতির চাকাকে সবুজ করার জন্য দু'শ কোটি টাকার রিভলভিং সবুজ পুনঃঅর্থায়ন তহবিল রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকে, যা দিয়ে প্রাথমিকভাবে রপ্তানি শিল্প যেমন, তৈরি পোশাক, চামড়া ইত্যাদিসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালিত চৌকস পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হয়েছে বিশ কোটি ডলার মূল্যের সবুজ রূপান্তর তহবিল। সবুজ অর্থায়ন কর্মসূচির যথার্থ বাস্তবায়ন করা গেলে নিশ্চয় বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের জন্য (যেমন, সবুজ টেক্সটাইল পণ্য, চামড়া) বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ নয়া সবুজ ব্র্যান্ডিংয়ের উৎসও হয়ে উঠতে পারবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় আর্থিক খাতের ভূমিকা, নীতি-পলিসি তৈরির প্রেক্ষাপটসমূহ নজিরবিহীন মনোযোগ আকর্ষণ করেছে গোটা বিশ্বে। সুবজ অর্থায়ন বৃদ্ধির জন্য বিশ্বের নীতি-নির্ধারকগণ বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঙ্গে একযোগে কাজ শুরু করেছে। চীনের কথাই ধরা যাক। অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশকে আরও এগিয়ে নিতে উচ্চাভিলাষী সবুজ অর্থায়নের উদ্যোগ নিয়েছে চীনের সরকার। চীনের গৃহীত নানাবিধ উদ্ভাবনী উদ্যোগের সঙ্গে পুরোমাত্রায় কাজ করে যাচ্ছে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক। নেদারল্যান্ড সরকার ব্যাংক-বীমা খাতের পাশাপাশি দেশটির পেনশন শিল্পের টেকসই অর্থায়ন আলোচনা জাতীয় কৌশলের অন্তর্ভুক্ত করেছে। উন্নত দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলো গ্রহণ করছে সবুজ অর্থায়ন কৌশল। কেনিয়ার কথা উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে। কেনিয়া এখন ডিজিটাল অর্থায়নে গোটা বিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জলবায়ু ঝুঁকি বিষয়টি মনে রেখে তারা উদ্ভাবনীমূলক সবুজ ডিজিটাল অর্থায়নের জন্য মোবাইল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্মে অ্যাপস যুক্ত করে সবুজ অর্থায়নের ধারণা সুকৌশলে কাজে লাগিয়েছে। সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ করছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষিক্ষেত্রে, বিশেষ করে মশলা ফসল উৎপাদন ও গবাদি পশু পালনের ভর্তুকি ঋণের সহায়তা নিশ্চিত করে নয়া মডেল সৃষ্টি করেছে। মডেলটি সবুজ উদ্যোক্তাদের জন্যেও অনুসরণীয় হতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক, সবুজ আর্থিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে প্রবর্তন করেছে সিএসআর। বর্তমানে সিএসআরের ১০ শতাংশ ব্যয়িত হচ্ছে সবুজ অর্থায়নের উদ্যোগ বাস্তবায়নের কাজে। বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্যে এই তহবিল ব্যয় করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এই অনুপাত ২৫ শতাংশে উন্নীত করা দরকার। সামাজিক উদ্যোক্তারা এই তহবিল থেকে সহযোগিতা পাচ্ছে। নয়া উদ্যোক্তারা প্রতিযোগিতা করে এই তহবিল থেকে সহযোগিতা নিচ্ছেন।

কম কার্বন খরচ করে যে বিকাশ; পরিবেশ-প্রকৃতি-জীববৈচিত্র্যের হাত ধরাধরি করে যে অগ্রগতি, তাকেই সরলভাবে সবুজ প্রবৃদ্ধি বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ, পরিবেশ-প্রতিবেশের ক্ষতি না করে যে প্রবৃদ্ধি, তা-ই হলো সবুজ প্রবৃদ্ধি। সবুজ প্রবৃদ্ধি হলো এমন নীতি ও পদ্ধতি, যা পরিবেশবান্ধব উপায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে। বাংলাদেশে সবুজ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে সর্বাধিক সংশ্লিষ্টদের সম্পৃক্ত করে সবুজ প্রবৃদ্ধি কৌশল তৈরি করতে হবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য বিমোচন, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, দূষণহ্রাস এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মতো জাতীয় অগ্রাধিকারের বিষয়গুলোর সঙ্গে সবুজ প্রবৃদ্ধির এ ধরনের সম্পৃক্ততার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সবুজ প্রবৃদ্ধির রাজনৈতিক অর্থনীতি আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে। সবুজ প্রবৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক সংলাপের সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা যায়, দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছার পাশাপাশি ইতোমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় অগ্রাধিকারগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত অংশীজনেরা সবুজ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য আগ্রহী।

টেকসই নির্মাণ, টেকসই বনায়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রিসাইক্লিং এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন খাতগুলোতে বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে সাফল্য দেখিয়েছে। তবে দেশে সবুজ প্রবৃদ্ধি অর্জনের সংস্কারের পথে বেশ কিছু শক্ত বাধা রয়েছে এবং এর নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে।

পরিবেশগত ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ইস্যু করার প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সরকারের সম্পৃক্ততা পর্যালোচনা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের তাদের নিকটবর্তী এলাকায় টেকসই বর্জ্য অপসারণ ও পুনর্ব্যবহারের রীতি গ্রহণ করে স্থানীয় সরকার জাতীয় ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং পরিবেশ সংরক্ষণে তাদের আওতাভুক্ত এলাকার জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে। পরিবেশ অধিদপ্তরের জনশক্তির তীব্র ঘাটতির বিষয়টি বিবেচনা করে বিষাক্ত বর্জ্যযুক্ত পানি উৎপাদনকারী খাতে ইটিপি পরিচালনা নিয়মিত পরিদর্শন করার কাজে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়োজিত করা যেতে পারে। পরিবেশ অধিদপ্তরে অভিযোগ না করেই যাতে নাগরিকেরা পরিবেশ আদালতে যেতে পারেন, সেই লক্ষ্যে পরিবেশগত আদালত আইন, ২০১০ সংশোধন করা, আদালতে বিচার প্যানেলে যোগ্য বিশেষজ্ঞদের জন্য পদ তৈরি করা যেতে পারে এবং দেশে বিদ্যমান সব আইন ও বিধিমালায় নির্ধারিত পরিবেশগত বিধি অনুযায়ী মামলা পরিচালনার অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে।

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধি, ১৯৯৭ সংশোধন করা যায়, যাতে পরিবেশগত বিধি লজ্ঘনের জন্য যথেষ্ট আর্থিক জরিমানা করা যায়, পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন এবং ইসিসি ইস্যু করার ক্ষেত্রে আরও কঠোরতা আরোপ করা যায় এবং পরিবেশগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ শক্তিশালী করা যায়।

■ *লেখক : এডি, ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট, প্র.কা.*

ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ (সিওপিডি)

ডা. মনিরুজ্জামান খান

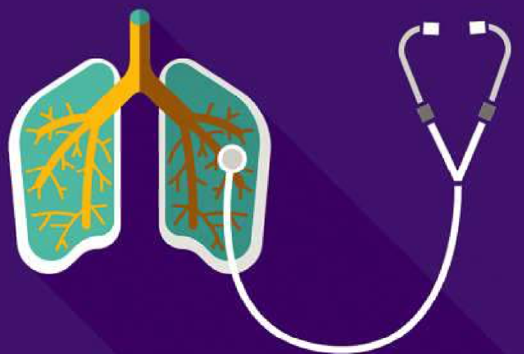

বিশ্বব্যাপী বর্তমানে মানুষের মৃত্যুর চতুর্থ প্রধান কারণ হলো সিওপিডি। আর ২০৩০ সাল নাগাদ এটা হবে মৃত্যুর তৃতীয় প্রধান কারণ। সিওপিডি শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহজনিত জটিল রোগ। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, পৃথিবীতে আনুমানিক ৩০ কোটি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। বাংলাদেশে ৪০ বছরের বেশি বয়সী মানুষের শতকরা প্রায় ১০ ভাগ সিওপিডি রোগে আক্রান্ত। যারা ধূমপান করেন তাদের মধ্যে এই সংখ্যা ১২ ভাগ এবং অধূমপায়ীদের মধ্যে ৩ ভাগ। বিএসএমএমইউ'র এক গবেষণা রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, ঢাকা মহানগরীতে ৩৫ বছরের উর্ধ্বে মানুষের ১১ দশমিক চার ভাগ সিওপিডি রোগে আক্রান্ত। আক্রান্তদের মধ্যে ১১ দশমিক ৭ ভাগ পুরুষ এবং ১০ দশমিক ৬ ভাগ নারী।

সিওপিডি বলতে সাধারণত দুটো জিনিস বোঝায়-

১. ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, ২. এমফাইসিমা।

যখন ফুসফুসে অবস্থিত বাতাসের থলিগুলোর বেশ কিছু দেয়াল নষ্ট হয়ে যায় তখন এমফাইসিমা হয়। যেহেতু থলিগুলোর দেয়ালের মাধ্যমেই আমাদের রক্ত প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পায় সেহেতু নষ্ট দেয়ালের জন্য শরীর যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন পায় না। দীর্ঘদিন ধরে শরীরে অক্সিজেন কম থাকলে বা কার্বন-ডাই-অক্সাইড জমে থাকলে বিভিন্ন অঙ্গের কর্মক্ষমতা কমে আসে।

বর্তমানে নারী ধূমপায়ীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই চিত্র ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছে। গর্ভকালীন ধূমপান সন্তানের জেনেটিক গঠন ক্ষতিগ্রস্ত করে। এক রিপোর্টে জানা যায়, বাংলাদেশে প্রায় ৮০ লাখ লোক সিওপিডি-তে আক্রান্ত। দ্য গ্লোবাল বার্ডেন ডিজিজ স্টাডি রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী এই রোগে ৩১ লাখ ৭০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। প্রতি ১০ সেকেন্ডে সিওপিডিতে আক্রান্ত হয়ে একজন রোগীর মৃত্যু হচ্ছে। প্রকৃত সংখ্যা হয়তবা এর চেয়েও বেশি।

সিওপিডি রোগের কারণ

ক. **ধূমপান**- ধূমপান যত অল্প বয়সে শুরু করা হবে এবং প্রতিদিন যত বেশি সিগারেট পান করা হবে, ক্ষতি তত বেশি হবে। যেমন- যদি কেউ এক বছর ধরে দৈনিক ২০টি করে সিগারেট খায় তাহলে এটি হবে এক প্যাক ইয়ার। আর যদি ২০ বছর সিগারেট খায়, তাহলে হবে ২০ প্যাক ইয়ার। সাধারণত সিওপিডি হতে ২০ প্যাক ইয়ার দরকার হয়। তারপর, যে যত বেশি ধূমপান করবে তার এটি তত বেশি হবে। যদি ৪০টি করে সিগারেট কনজ্যুম করে, তাহলে ১০ বছরের মধ্যে হয়ে যাবে।

খ. **ঘরে ও বাইরের দূষণ**

১. রান্নায় ব্যবহৃত জীবাশ্ম জ্বালানি, যেমন-কাঠ, কয়লা, শুকনো পাতা, খড়ি ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন ধোঁয়া,

২. অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, কলকারখানা ও যানবাহনের উৎপন্ন ধোঁয়ায় বায়ু দূষণ, রাসায়নিক পদার্থ ও ধুলাবালি

৩. মশা মারার কয়েলের ধোঁয়াঃ ছয় ঘণ্টা একটি মশার কয়েল জ্বললে তা প্রায় ১০০টি সিগারেটের সমান।

গ. কিছু ক্ষেত্রে বংশগত কারণ দায়ী।

সিওপিডি সম্পর্কে বুঝে সচেতন হওয়ার জন্য ফুসফুসের কাজ সম্পর্কে জানতে হবে।

মানুষের বুকের ভিতরে হৃদপিন্ডের দুই পাশে দু'টি ফুসফুস রয়েছে। ফুসফুস শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে ব্যবহৃত হয়। এই শ্বাসযন্ত্রটির প্রধান কাজ হলো বাতাস থেকে অক্সিজেনকে রক্ত প্রবাহে নেয়া এবং রক্ত প্রবাহ হতে কার্বন ডাই-অক্সাইডকে বাতাসে নিষ্কাশন করা। এই গ্যাস আদান-প্রদান হয় বিশেষায়িত কোষ দ্বারা তৈরি খুবই পাতলা দেয়ালবিশিষ্ট লক্ষাধিক বায়ু থলির মাধ্যমে যাকে অ্যালভিওলাই (Alveoli) বলে। সিওপিডি বা ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজের ফলে এই থলিগুলোতে কম বাতাস যায়।

কেন বাতাস কম যায় তার নানাবিধ কারণ রয়েছে। যেমন-

১. থলি বা বাতাস যাওয়ার নালিগুলোর স্থিতিস্থাপকতা কমে গেলে,

২. থলিগুলোর কিছু দেয়াল নষ্ট হয়ে গেলে,

৩. নালিগুলোর দেয়াল মোটা হয়ে বাতাস প্রবাহের পথ সরু হয়ে গেলে,

৪. নালিগুলোতে কফ জমে বাতাস যাওয়ার পথে বাধাপ্রাপ্ত হলে,

রোগের উপসর্গ

১.শ্বাসকষ্ট বা 'নিড ফর এয়ার'- হলো প্রথম লক্ষণ;

২. ক্রমাগত কাশি সেই সঙ্গে কফ;

৩. বুকের মধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ;

৪. দম ফুরিয়ে যাওয়া, সিঁড়ি বা উঁচু জায়গায় ওঠানামার ক্ষেত্রে বুকে চাপ অনুভব করা বা শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়া,

৪. বুক হালকা লাগা,

৫. সবসময় ক্লান্ত লাগা, অরুচি, দুশ্চিন্তা, শরীরে পানি জমতে পারে, হাড় ক্ষয় ইত্যাদি হতে পারে।

বেশিরভাগ মানুষ শুরুতে এই শ্বাসকষ্টকে পাত্তাই দেয় না। সাধারণ সর্দি-কাশি বা ধূমপানের কারণে এমনটা হচ্ছে বলে ধরে নেয়। কিন্তু, সাধারণ কাশি দিয়ে শুরু হলেও কিছুদিনের মধ্যে তা দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের রোগে আকার নেয়। আর এই রোগে একবার আক্রান্ত হলে রোগী ধীরে ধীরে খারাপের দিকেই যায় এবং কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এমনকি হাঁটাচলা করাও কঠিন হয়ে পড়ে। শুধুমাত্র সচেতনতার অভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ৫০ শতাংশ সিওপিডি রোগী সনাক্তের বাইরে থাকে এবং তারা পরবর্তীতে বিভিন্ন জটিলতা নিয়ে চিকিৎসকের কাছে আসেন। সুতরাং, এ ধরনের লক্ষণ দেখা দিলে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। চিকিৎসক প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করে বুঝতে পারবেন ভিতরে কত পরিমাণ অক্সিজেন কম ঢুকছে বা শ্বাসনালির কতটা সঙ্কোচন হচ্ছে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

ক) বক্ষব্যাধির সমস্যা নির্ণয় করতে-

১. বুকের এক্স-রে;

২. স্পাইরোমেট্রি;

৩. রক্ত ও কাশির পরীক্ষা;

৪. বুকের সিটিস্ক্যান,

খ) সিওপিডি রোগের কারণে রক্তনালি নষ্ট হয় এবং এতে রক্তচাপ বেড়ে যায়। ফলে হৃদপিন্ডের ডান প্রকোষ্ঠে চাপ বাড়ে। তাই, হৃদপিন্ডের অবস্থা জানতে করা হয়-

১. ইসিজি,

২. ইকো কার্ডিওগ্রাফি।

চিকিৎসা

এই রোগ সম্পূর্ণ নির্মূল হয় না। চিকিৎসা হলো উপসর্গকে কিছুটা প্রশমিত রাখা এবং ফুসফুসের কার্যক্ষমতা হ্রাস নিয়ন্ত্রণ করা। তাই প্রতিরোধই সর্বোত্তম পন্থা।

১. ধূমপান ও পরিবেশ দূষণ রোধ করতে হবে। নিজে ধূমপান করবেন না এবং অন্যকে ধূমপান করতে দিবেন না। সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলে সিওপিডিতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা যেমন হ্রাস পাবে তেমনিভাবে স্বাস্থ্যখাতের ব্যয়ও অনেকটা কমে আসবে। ধূমপান নিরাময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে পারলে ধূমপায়ীদের নেশার জগত থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সহজ হবে।
২. পরিবেশবান্ধব চুলার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
৩. ধোঁয়া-ধুলা এড়াতে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।
৪. স্বাস্থ্যকর জীবনাভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
৫. দৈনিক খাবারের পাঁচভাগ ফল ও সবুজ শাক- সবজি খেতে হবে। যা সিওপিডি-তে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমায়।
৬. চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী শ্বাসনালী প্রসারিত হয় এমন ব্রঙ্কোডায়েলেটর, স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধের নিয়মিত ব্যবহার নিশ্চিত করা। ঔষধ গ্রহণের জন্য সঠিক পদ্ধতিতে ইনহেলার ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি।
৭. কখনও ইনফেকশন বা অ্যালার্জিজনিত কারণে উপসর্গগুলো বেড়ে গেলে যেমন-হঠাৎ শ্বাসকষ্ট, কফের পরিমাণ বেড়ে গেলে, কফের রং পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে। কারণ, ইনফেকশন ফুসফুসকে স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ঋতু পরিবর্তনের সময় অনেকের শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে রোগীকে সচেতন থাকতে হবে। প্রয়োজনে বাড়িতে অক্সিজেন নেয়া এবং শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করতে মেশিনের সাহায্যে শ্বাস নেয়ার ব্যবস্থা করা।
৮. প্রতি বছর একবার ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন এবং প্রতি ৩-৫ বছরে একবার নিউমোনিয়ার ভ্যাক্সিন নেয়া যেতে পারে।
৯. পালমোনারি রিহ্যাবিলিটেশন বা ফুসফুসের পুনর্বাসন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ফুসফুসের কার্যক্ষমতা ফিরিয়ে আনার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করে ফুসফুস ও শ্বাস-প্রশ্বাসের মাংসপেশীগুলোর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা, শরীরের মাংসপেশী নমনীয় ও প্রসারিত করার ব্যায়াম, কাঁধের ব্যায়াম, পায়ের ব্যায়াম প্রভৃতির পাশাপাশি স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস, রোগ সম্পর্কে ধারণা প্রদান, ছোট ছোট সমস্যাগুলো মোকাবেলা করতে শেখানো, বিকল্প জীবিকা সম্পর্কে ধারণা ইত্যাদি সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে রোগীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উন্নতি করা। ফুসফুসের শক্তি কমে যাওয়ায় যাদের মধ্যে রোগের উপসর্গের উপস্থিতি বেশি এবং সর্বোচ্চ চিকিৎসা গ্রহণ করেও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারছেন না অর্থাৎ, শারীরিক অক্ষমতায় ভুগছেন, তারা পালমোনারি রিহ্যাব কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলে বেশি উপকৃত হবেন। পালমোনারি রিহ্যাবের মাধ্যমে রোগীর মনে বাঁচার নতুন আশা জেগে ওঠে।
১০. রোগীর শরীর অন্য কোনো রোগ যেমন-ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, দুশ্চিন্তা-হতাশা, ঘুমের সমস্যা, অ্যাসিডিটি প্রভৃতি থাকলে সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে।

■ *লেখক: মেডিকেল অফিসার, চিকিৎসা কেন্দ্র, ঢাকা*

মায়ের ভালোবাসা

শাহ মোঃ নেওয়াজ শরীফ

পৃথিবীতে যদি নিঃস্বার্থ কোনো ভালোবাসা থেকে থাকে সেটা হলো মায়ের ভালোবাসা। মায়ের ভালোবাসার কোনো বিনিময় হয় না। মায়ের ঋণও কখনো শোধ করা যায় না। পৃথিবীতে মায়ের মতন আপন কেউ হতে পারবে না। শত কষ্টের মাঝেও মা তার সন্তানের গায়ে একফোঁটা আঁচড় লাগতে দেয় না। অনেকক্ষেত্রে সন্তানের হাসি যেন মায়ের হাসি হয়ে যায়। সন্তানের সব আবদার মা হাসি মুখে মেনে নেয়।

মায়ের ভালোবাসার উদাহরণস্বরূপ আমি একটি গল্প শোনাচ্ছি : -

১৬ বছরের একটি ছেলে তার মাকে বলল তুমি আমার ১৮ বছরের জন্মদিনে কি উপহার দিবে। ছেলের কথা শুনে তার মা বলল যখন তোর বয়স ১৮ বছর হবে তখন আলমারি খুলে দেখিস আলমারির ভেতরেই তোর উপহার থাকবে। যদি এখন তোকে বলে দেই তাহলে উপহারের কোনো মজাই থাকবে না। উপহারটি তোর জন্য বড় একটি সারপ্রাইজ হবে। কিছুদিন পর ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়লো। অসুস্থ ছেলেকে বাবা-মা হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং হাসপাতালে চেকআপ করার পর ডাক্তার বলল আপনার ছেলের হৃদপিন্ডে একটি ফুটো আছে। আপনার ছেলে আর মাত্র দুই মাসের বেশি বাঁচবে না। এরপর যখন ছেলেটি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে তখন সে জানতে পারে তাঁর মা আর পৃথিবীতে নেই। এটি শুনে তার চোখ থেকে জল পড়তে থাকে। সে কাঁদতে কাঁদতে আলমারির কাছে যায় এবং আলমারিটি খুলে দেখে একটি গিফট রাখা আছে। সে দ্রুত সেই গিফট বক্সটি খোলে এবং দেখে সেখানে একটি চিঠি রাখা আছে। চিঠিতে লেখা আছে- আমার প্রাণের ছেলে যদি তুই চিঠিটি পড়িস তার মানে তুই সুস্থ আছিস। তুই যখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলি তখন তোকে আমরা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তার বলেছিল তোর হৃদপিন্ডে একটি ফুটো আছে। জন্ম থেকেই তোর হৃদপিন্ডে ফুটো ছিল। আমি আর তোর বাবা আগে থেকেই জানতাম। এই কথাটি আমি আর তোর বাবা ১৬ বছর ধরে নিজের মনের ভিতর লুকিয়ে রেখেছিলাম, তোকে কখনো বলিনি এই জন্য আমাদের ক্ষমা করে দিস। সেদিন যখন ডাক্তার বলেছিল তুই আর দুই মাসের বেশি বাঁচবি না সেই রাতে আমি সারারাত কাঁদতে থাকি এবং তোর কপালে চুমু খেতে থাকি। আমি সিদ্ধান্ত নিই আমি আমার হৃদপিন্ড তোকে দিয়ে দিব আর আমি সেটাই করি। তোর মনে আছে তুই একদিন আমাকে বলেছিলি মা আমার ১৮ বছরের জন্মদিনে তুমি কি উপহার দিবে? আমি তোকে আমার হৃদয়টাই দিয়ে দিলাম। একে তুই সবসময় যত্ন করে রাখিস আর তোর এই মাকে সবসময় মনে রাখিস।

সন্তানের জীবনের সুখের জন্য মা তার নিজের জীবন পর্যন্ত হাসতে হাসতে দিয়ে দেয়। মায়ের ভালোবাসার কোনো সীমা হয় না, কোনো মূল্য হয় না। মায়ের মনের গভীরতা কেউ দেখতে পায় না। মায়ের মতন পৃথিবীতে আর কেউ হতে পারবে না। তাই মাকে সবসময় ভালোবাসুন। সবশেষে আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ করতে চাই, যাদের মা বেঁচে আছে মাকে মনে-প্রাণে ভালোবাসুন। মায়ের সেবা যত্ন নিন, তাদের খোঁজখবর রাখুন। লেখাটি পড়ার পর অবশ্যই আজ একবার আপনার মাকে জড়িয়ে ধরে বলুন- মা আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। আর যাদের মা পৃথিবীতে নেই তারা অবশ্যই আজ প্রাণ খুলে মায়ের জন্য দোয়া করবেন।

■ *লেখক: ডিডি, সচিব বিভাগ, প্র.কা.*

আমার পর্বতারোহণ

ফায়েজা রহমান ইভা

আমি ঢাকাবাসী। খোলা আকাশ দর্শন আর দূষণমুক্ত বাতাস সেবনের বিলাসিতা কপালে কদাচিৎ জোটে। আমার হাঁটাহাঁটির ব্যাপ্তিও বড় নগণ্য। বাসা থেকে বের হয়ে লিফট, লিফট থেকে বের হয়ে রিক্সা আবার রিক্সা থেকে নেমে লিফট এবং লিফট থেকে বের হয়ে অফিসের ডেস্কে যাওয়া পর্যন্তই আমার হাঁটাচলা। এই আমি গেলাম হাইকিং এ। তাও বিদেশের মাটিতে। ব্যাপারটা খুব একটা জটিল ছিলনা। 'শহরের কোলাহল থেকে দূরে প্রকৃতির কাছাকাছি' টাইপের উইক এন্ড প্ল্যান। কিন্তু এইরকম সাদামাটা প্ল্যানও যে এমন রোমহর্ষক হয়ে দাঁড়াতে পারে তা ছিল আমার ধারণার বাইরে। সফলভাবে বেঁচে থাকার অনুভূতি কেমন আমি জানিনা। আমি সেই দলে পড়িনা। কিন্তু সচলভাবে বেঁচে থাকতে পারা যে সৃষ্টিকর্তার এক বিশাল আশীর্বাদ এ বিষয়ে সেদিনের পর থেকে আর কোনো দ্বিমত পোষণ করব না। দিনশেষে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করা সুন্দর ছবিগুলো নয়, এই উপলব্ধিটাই আমার একমাত্র প্রাপ্তি।

এবার হাইকিং কথনে ফিরে আসি। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় জাপান একটি ভল্কানিক দ্বীপ। অ্যাকটিভ ভল্কানিক পাহাড় যেমন রয়েছে, তেমনি আছে বরফের টুপি পড়ানো জাপানিজ আল্পস। আর মাউন্ট ফুজির কথা তো বলার অপেক্ষা রাখেনা। আমাদের গন্তব্য ছিল টোকিওর পাশেই ইয়ামানাশি প্রিফেকচারের ওৎসুকিতে। টোকিও স্টেশনকে যদি টোকিও মেগাসিটির মধ্যমনি ধরি তবে সেখান থেকে প্রায় আটানব্বই কিলোমিটার দূরে আমার গন্তব্য। তবে জাপানের সুবিধাজনক ট্রেন নেটওয়ার্কের বদৌলতে আটানব্বই কিলোমিটার শুনে আঁতকে ওঠার কিছুই নেই। ঘণ্টা দুয়েকের ব্যাপার মাত্র।

ডে হাইকিংয়ের প্ল্যান। হাইকিং পিকের নাম ১৫৯৩ মিটার উচ্চতার সেইহাচিয়ামা। ১৩ কিলোমিটারের ট্রেইল। নর্মাল পেসে হাঁটলে ৬/৭ ঘণ্টায় পৌঁছে যাওয়ার কথা। কিন্তু টুইস্ট হলো, টিমে ছিলাম আমি। আমার এক্সপেরিয়েন্স লিফট নষ্ট থাকলে সিঁড়ি ক্লাইম্বিং করে পাঁচতলা ওঠা পর্যন্তই। টিমের বাকিরা আমার ভিয়েতনামিজ ফ্রেন্ডস, এক্সপেরিয়েন্সড হাইকার আর আমি দুধভাত। যদিও ভেতরটা ধুকপুক ধুকপুক করছিল তাও সাহস করে গেলাম। সবকিছুরই প্রথমবার থাকে। আমি যখন ছোট ছিলাম, প্রথমবার হাঁটার প্ল্যান করছিলাম, তখনও নিশ্চয়ই আমার এমন লাগছিল। দুর্ভাগ্যবশত ব্যাপারটা আমার মনে নেই। আমার আব্বা আম্মাও এখনকার বাবা-মা'দের মতো স্মার্ট ছিলনা তাই ছবি তুলে প্রমাণাদি রাখারও কোনো প্রয়োজন বোধ করেননি। কি আর করা! ধরে নিলাম হাঁটতে যখন সফল হয়েছি হাইকিংয়েও কোনোভাবে উতরে যাব। সুতরাং, বন্ধুরা যখন প্ল্যান ঠিক করে আমার সম্মতি চাইল, আমি নেচে নেচে বলে দিলাম, অক্কে। আর মনে মনে বললাম, ইয়া আল্লাহ্ মান ইজ্জত বাঁচাইয়ো।

আমরা বাসা থেকে ওৎসুকির উদ্দেশে রওনা করেছিলাম সকাল পৌনে আটটার দিকে। ট্রেনের দেড় ঘণ্টার পথ মানে ঘুমিয়ে নেয়ার জন্য অনেক সময়। কিন্তু টোকিওর ব্যস্ত শহরের ফাঁকফোকর ভেদ করে উঁকি দেয়া মাউন্ট ফুজির মাথাটা ঘুমাতে দিচ্ছিলনা একদমই। এর উপর রেললাইনের দুইপাশে ওয়েস্টার্ন টোকিওর পাহাড়ের সারির কথা তো বাদই দিলাম। টোকিওতে তখন মাঝ হেমন্ত। পাতাদের রং বদল করে ঝরে যাওয়ার সময়। প্রকৃতির এই রূপ বলেকয়ে বা লিখে বোঝানো বড় মুশকিল। এ যেন কোনো রঙ্গিলা চিত্রকরের বিশাল ক্যাম্পাস। একদিকে লাল ম্যপললিফ তো অন্যদিকে হলুদ গিঙ্কু ট্রি। যতই টোকিও থেকে দূরে যাচ্ছিলাম, রঙের ছটা যেন ততই বাড়ছিল। গন্তব্যে যখন পৌছালাম প্রায় সাড়ে নয়টা বেজে গিয়েছে। ওয়ার্কিংডেতেও সুনশান স্টেশন। বুঝলাম প্রকৃতিকে ঘাটাবার উপকরণ এখানে খুবই কম।

অতঃপর হাইকিং শুরু। স্টেশনের প্রবেশমুখেই ঐ এলাকার হাইকিং ট্রেইলের এক বিশাল ম্যাপ বসানো। যদিও জাপানিজ তবে গ্রাফিক্যাল লেভেলিংয়ের কারণে মর্মোদ্ধার করাটা অতোটা দুঃসাধ্য নয়। পিকের উচ্চতা থেকে শুরু করে সেখানে যাওয়ার রাস্তা ও সম্ভাব্য সময় সবই দেয়া আছে। সবকিছু প্ল্যানমাফিক চললে, দিনের আলো থাকতে থাকতেই হাইকিং শেষ করে আসা সম্ভব। পাহাড়সারির ভেতরে অনেকদূর পর্যন্ত আমরা প্রশস্ত পাকা রাস্তা দিয়েই এলাম। বুঝলাম ইহা জাপান। আমাদের হাইওয়ের রাস্তা ভাঙ্গাচোড়া থাকতে পারে তবে এদের জঙ্গলের রাস্তা নয়। টোকিওর কাছাকাছি এমন অনেক হাইকিং ট্রেইলও আছে যেখানে পাকা রাস্তায় হেঁটে এবং সিড়ি বেয়ে পিকে পৌঁছানো সম্ভব। এরপরেও যদি কষ্ট লাগে, নো প্রবলেম। আছে কেবল কার ও চেয়ার লিফট। সুতরাং জাপানে হিল পড়ে বেবি স্ট্রলার নিয়ে হাইকিং করা মোটেও কোনো রূপকথা নয়। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের ট্রেইলে এমন কিছুই ছিলনা। প্রায় ৪০ মিনিট সভ্য রাস্তায় হাঁটার পর শুরু হলো আসল হাইকিং। রাস্তা এখন অনেক স্টিপার। হেমন্তের বিদায়লগ্ন এখানে শুরু হয়ে গিয়েছে। রাস্তার উপর ঝরা পাতার স্তুপ, আর দুইপাশে পাতা শূন্য ন্যাড়া গাছ। কিছুদূর পরপর পাহাড়ি ঝর্ণার স্রোত। হেমন্তের আলোতে ঝিলমিলিয়ে উঠা সেই বহতা স্রোতধারা যেন শতকোটি হীরকচুর্ণ সাথে করে নিয়ে যাচ্ছে। এই দৃশ্য পার্কে বসে আরাম করে দেখতে পারলে হয়তো দুই লাইন কবিতা লিখে ফেলা যেত। কিন্তু শরীর তখন এমন ঠান্ডার মধ্যেও গলদঘর্ম। লক্ষ্য একটাই যে করেই হোক, দুপুর একটার মধ্যেই চূড়ায় পৌছাতে হবে। রাতের শিশির পড়ে রাস্তা কিছুটা পিচ্ছিল। পাতা ডালপালা মাড়িয়ে উপরে উঠছি। পাথরের উপর লাফিয়ে পাহাড়ি ঝর্ণা পার হচ্ছি। এই করতে করতে চলে গেল আরো এক ঘণ্টা। এখন নতুন চ্যালেঞ্জ। পাহাড়ের মধ্যেই খাড়া ঢালের মতো কিছু জায়গায় শাকসবজি চাষ করা হচ্ছে। বন্য হরিণ যেন খেয়ে সাবাড় করতে না পারে সে জন্য পুরো এলাকায় নেটের বেড়া দেয়া। বেড়ার গায়েই ডিরেকশন দেয়া ছিল কিভাবে খুলে ভেতরে ঢুকতে হবে। আমরা তাই করলাম। ঢোকার পরে আবার লাগিয়ে দিলাম। রাস্তা এখন আরো খাড়া। নিচে পিচ্ছিল কাদামাটি। দুইহাতে ডালপালা সরিয়ে সামনে এগোতে হচ্ছে। নিজেকে অ্যাডভেঞ্চার মুভির নায়িকা মনে হচ্ছিল কিন্তু আফসোস কোনো ক্যামেরা ছিলনা। রাস্তা যেহেতু খুবই সরু, একজন একজন করে উপরে উঠছি। ক্ষেত-খামার যখন পার হলাম তখন আমরা প্রায় ১০০০ মিটার উচ্চতায়। আশেপাশের অনেক পাহাড়ের চূড়া নিচে পড়ে গিয়েছে। ছবি তোলার একটু ফুরসত পেয়ে ওরকম অর্ধমৃত অবস্থাতেও সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ভুললাম না।

রাস্তা এইবার কিছুটা বাগে এলো। যদিও স্টিপ, তাও হাঁচড়ে পাঁচড়ে, ডালপালার বাড়ি খেয়ে ঘণ্টা দেড়েক কসরৎ করে, কোনোরকমে জান হাতে নিয়ে উঠে গেলাম চূড়ায়। আমরা এখন সেইহাচিয়ামার চূড়ায়। আসার পথের প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টার পরিশ্রমের মুহূর্তে মনে হয়েছে, কি দরকার ছিল, কেন বাসায় শুয়ে ঘুমালাম না, কোন ভুতের আছরে আজ আমি পাহাড়ে। কিন্তু চূড়ায় উঠার পর আমি মত পাল্টালাম।

আমাদের ছোটবেলার একটা প্রচলিত ধাঁধা ছিল। স্কুলের খাতায় একটা রেখা টেনে বলতাম এটাকে কোনো কাটাছেঁড়া করা ছাড়াই ছোট করতে হবে। সেটা কিভাবে করা যায়। সমাধান হলো, ঐ রেখার পাশে আরেকটা লম্বা রেখা আঁকতে হবে। পাশেই আরেকটা বড় রেখা থাকলে তো আপনা আপনিই আগের রেখাটা ছোট হয়ে গেলো। ব্যাপারটা ছেলেভুলানো সোজাসাপটা ধাঁধা হতে পারে কিন্তু এর অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু এত সহজ নয়। সম্ভবত সে কারণেই ১৫৯৩ মিটার উচ্চতায় দাঁড়িয়েও প্রকৃতির বিশালত্বের কাছে নিজেকে অনেক নগণ্য মনে হচ্ছিল। সামনে মাউন্ট ফুজি আর তার বরফের টুপি। যদিও এত কাছে থেকে দেখে সেটাকে আর টুপি মনে হচ্ছে না। বরং মনে হচ্ছে সাদা মুকুট পড়া রাশভারী কোনো রাজা। মেঘের সৈন্যদল ভীষণ ভয়ে ভয়ে যাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। চারপাশের আদিগন্তজুড়ে তার রাজ্য বিস্তৃত। হেমন্তের শেষবেলার ছোঁয়ালাগা বাদামি পাহাড়গুলো রাজার অনুগত প্রজা। এমনি এক প্রজার মাথায় চেপে আমি হা করে রাজার রাজ্য শাসন দেখছিলাম। এ এমন এক দৃশ্য যা কখনো পুরনো হয়না। যা বারবার দেখেও ক্লান্তি আসেনা। এমনকি ক্লান্ত শরীরও চাঙ্গা হয়ে যায়। সুতরাং সেইহাচিয়ামার চূড়ায় বসে লাঞ্চ শেষ করে যখন হোঞ্জাগামারুর (১৬৩০ মিটার) উদ্দেশে রওনা হলাম তখন বেশ চাঙ্গাবোধ করছিলাম। আরো ৪০ মিনিটের পথ। তবে এবার আর ট্র্যাকিং ট্রেইল নেই। বড় বড় পাথর বেয়ে উপরে উঠতে হচ্ছে। এক জায়গায় পাথরের আকৃতি বেশ বড় হওয়ায় দেখলাম ছোট একটা মই বসিয়ে রাখা হয়েছে। জাপানিজ ট্রেইল বলে কথা। এই ৪০ মিনিটের রাস্তায় প্রায় পুরোটা সময় ধরেই মাউন্ট ফুজির ভিউ ছিল। ১৬৩০ মিটার উচ্চতার হোঞ্জাগামারুর চূড়ায় উঠার পর তো কথাই নেই। পুরো সাসাগোমাচি এলাকার ৩৬০ ডিগ্রি ভিউ আর সাথে মাউন্ট ফুজি তো আছেই। এবার ফেরার পালা। আবারো সেই পাথরের চাঁই বেয়ে বেয়ে কিছুটা নামার পরে মাটির ট্রেইলের দেখা মিললো। মাউন্ট ফুজিকে বাই বলে নামা শুরু করলাম। গতি কিছুটা বাড়লো কিন্তু যন্ত্রণা হল নিয়ন্ত্রণ নিয়ে। তার উপর দিন এখন ছোট। দ্রুত নামার তাড়া, রাস্তাও ভীষণ খাড়া সাথে আমার অনভ্যস্ত আনাড়ি পা। সব মিলিয়ে বিশাল গ্যাঁড়াকলে পড়লাম। কিন্তু থামার উপায় নেই। দলের সবাই এগিয়ে যাচ্ছে। নামার রাস্তায় আরেকটা ছোটখাটো পাহাড়ের চূড়া। আমরা সেটাতেও উঠলাম। পা তখন একটুকরো সমতলের জন্য হাহাকার করছে। কিন্তু আসল চ্যালেঞ্জ শুরু হলো এবার। আমরা ডিরেকশন দেখে আগালাম। ট্রেইলমার্কের ডিরেকশনের সাইনটা আধভাঙ্গা হয়ে ছিল আমরা সেটাকে ঠিক করে দিয়ে আসতে ভুললাম না। কিন্তু কিছুদুর এগোনোর পর আর ট্রেইল খুঁজে পেলাম না। অগত্যা খাড়া পাহাড়ের ঢাল ধরেই নামতে থাকলাম। মাটিও এখন বেশ আলগা। পাতার স্তুপের নিচে কোথায় যে পা রাখার মতো শক্ত মাটি আর কোথায় আলগা পাথর বোঝার উপায় নেই। ডালপালাগুলোকেও আর বিশ্বাস করা যাচ্ছেনা। বডি ব্যালেন্স করার জন্য ডালপালা ধরতে গেলে অনেক সময় সেগুলোও ভেঙ্গে আসছে। পায়ের আঙ্গুলগুলোর উপর প্রচন্ড প্রেসার পড়ায় ইতোমধ্যে ব্যথা শুরু হয়ে গিয়েছে। গোড়ালি ছাড়িয়ে ব্যথা এখন হাঁটুতে। তারপরেও থামলাম না। পড়লাম, উঠলাম, আছাড় খেলাম, ডালপালার বাড়ি খেলাম। একসময় এমন অবস্থা হলো যে পায়ে কোনো অনুভূতি আর কাজ করছে না। পড়ে গেলেও আর পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছি না। গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে নামতে হচ্ছে। দিনের আলো কমে এসেছে। শরীর প্রচন্ড ক্লান্ত। যখন মনে হলো আর হয়তো পারবইনা তখনই দেখতে পেলাম সমতল রাস্তা। যাক হাত পা ভাঙ্গা ছাড়াই এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম তাহলে। হুড়োহুড়ি করে নেমে রাস্তার পাশে প্রায় সাতফুট উঁচু দেয়ালের উপর দাঁড়িয়ে বুঝলাম লাফ দেয়া ছাড়া সমতলে নামার উপায় নাই। বন্ধুরা বলল তুমি লাফ দাও আমরা তোমাকে ধরবো। মনে মনে বললাম, আল্লাহ বাঁচাও। মান ইজ্জতের ব্যাপারটা আর উল্লেখ করলাম না।

অতঃপর কারো ধরাধরি ছাড়াই মাটিতে পা রাখলাম। কিন্তু পা আর অক্ষত রাখা গেল না। গোড়ালিতে প্রচন্ড ব্যথা পেলাম। কিন্তু তারপরেও খুশি, এক টুকরো সমতলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হলেও হাঁটতে পারছি। দলনেতা বলল, এই রাস্তায় আর দেড় কিলোমিটার হাঁটলেই স্টেশন। কিছুদূর হাঁটার পর আবিষ্কার করলাম এতো ঝক্কির আসল কারণ। আমরা আসলে ভুল পথে নেমেছি। যে রাস্তায় নামার কথা ছিল সেটা আরো ওয়েলমার্কড এবং তুলনামূলকভাবে কিছুটা সভ্য-ভব্য করার চেষ্টাও করা হয়েছে। বিশেষ করে দেয়ালের সাথে গাঁথা রডগুলো দেখে পায়ের ব্যথাটা যেন আরো বেড়ে গেল। এতক্ষণে আমরা বুঝলাম আধাভাঙ্গা ডিরেকশনের রহস্য। রাস্তা খারাপ দেখে ইচ্ছে করেই সেটা ভেঙ্গে রাখা হয়েছিল। সেই ভাঙ্গা ডিরেকশন ঠিক করার জন্য নিজেদেরকে এতক্ষণ হিরো হিরো মনে হলেও অচিরেই আমরা নিজেদের কাছেই ভিলেনে পরিণত হলাম। যাই হোক, নতুন কোনো অ্যাডভেঞ্চার ছাড়াই বাসায় পৌঁছানো যাবে এই খুশিতে আমরা বাদাম খেতে খেতে ফরেস্ট রোডে হাঁটছিলাম। সূর্য তখন প্রায় ডুবুডুবু। এমন সময় হঠাৎ এক লোক গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করলো কোথায় যাব? অবশ্যই জাপানিতে তবে আমাদের টিমে জাপানিজ জানা বন্ধু থাকায় যোগাযোগ চালাতে অসুবিধা হলোনা। আমরা কনফিডেন্টলি উত্তর দিলাম সাসাগো স্টেশন। সে এবার খুবই উৎকণ্ঠিত হয়ে উত্তর করল, এই রাস্তা তো সাসাগো স্টেশন যাবেনা। তোমাদের এই ট্রেইল ধরে নিচে নেমে স্টেশনে যেতে হবে। এই বলে সে আমাদের ট্রেইলমার্কের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। আমার তো মাথায় হাত। পায়ের এই অবস্থা নিয়ে কিভাবে কি! যদিও ইচ্ছে করছিল না তারপরও পথপ্রদর্শনকারীকে ধন্যবাদ দিয়ে আবারো সংগ্রাম শুরু করলাম। এবারের রাস্তা আরো স্টিপার। এবং মরার উপর খাঁড়ার ঘা, চারপাশ দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসছে। আমি জানি আমাকে দ্রুত নামতে হবে, আমার জন্য আমার টিমমেটরা পিছিয়ে পড়ছে কিন্তু আমি এগুতে পারছিনা। আমি যতই চেষ্টা করছি আমার গতি যেন ততই কমছে। এইরকম অসহায়ত্ব জীবনে আর কখনো অনুভব করেছি কিনা মনে করতে পারিনা। চারপাশ এখন পুরোপুরি অন্ধকার। আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেললাম। পাহাড়ি ঝর্ণার পানির শব্দ শুনে বুঝতে পারছি কাছাকাছি চলে এসেছি কিন্তু কোনদিকে যাবো বুঝতে পারছি না। আমার মোবাইলের চার্জ শেষ। অন্যদের মোবাইলের আলোয় এক পা এক পা করে এগুচ্ছি। আমি কিভাবে কিসের বলে এগুচ্ছি নিজেই বুঝতে পারছিনা। পায়ের উপর কোনো কন্ট্রোল নেই। পা উপরে তুলতে পারছিনা। পায়ের উপর ভর দিয়ে নিচুও হতে পারছিনা। কিছুদূর পরপরই বেসামাল হয়ে পড়ে যাচ্ছি। কিন্তু থামছিনা। কোনো একভাবে আমার পুরো শরীর প্রোগ্রামড হয়ে গিয়েছে যে আমাকে এখন এগুতে হবে। শুরু হলো অনুমানের উপর রাস্তা চলা। ম্যাপ আর মোবাইলের ডিরেকশন দেখে অন্ধকারেই এগোতে থাকলাম। সকালে যে ঝর্ণার স্রোত দেখে কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছিল রাতের বেলায় সেটাকে মনে হলো বিভীষিকা। আমি এরকম অকেজো পা নিয়ে কিভাবে পিচ্ছিল পাথরে আছাড় খাওয়া ছাড়াই ফেরত এলাম সে এক রহস্য। একসময় চোখে পড়লো একটা ড্যাম। ড্যামের পরেই স্টেশনে যাওয়ার রাস্তা থাকার কথা। পেলাম না। আবার সামনে এগোলাম। মাথার উপর অর্ধেক চাঁদের আলো। সেটা কোনো কাজে তো আসছেইনা বরং আরো ভূতুড়ে পরিবেশ সৃষ্টি করছে। কিন্তু কি অদ্ভুত! ভয়ের অনুভূতিও কাজ করছেনা। ভেতরে ভেতরে একটা চাপা কান্না। নিজের ভাষায় কাছের কাউকে বলতে ইচ্ছে করছে যে আমার কত কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু পারছিনা। যে খালি বাসাটায় আমার ফেরত যেতে ইচ্ছে করত না, আজ সেখানে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ দলনেতার চিৎকার, 'উই ফাইন্ড দ্য ডিরেকশন। উই ক্যান গো হোম'। আমি কেঁদে ফেললাম। অন্ধকার থাকায় কেউ দেখেনি। আল্লাহ দয়াময়। আমার জানের সাথে সাথে মান-সম্মান কিছুটা হলেও বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

শেষবারের মতো পাথুরে পানি-প্রবাহ পার হয়ে আমরা সমতল রাস্তায় পা রাখলাম। সাসাগো স্টেশন এখান থেকে দেড় কিলোমিটারের পথ। আমরা হাঁটছি, আমাদের পেছন পেছন চাঁদের আলো হাঁটছে। সেই আবছা চাঁদের আলোয় চোখে পড়ল একটা সাইন। তাও আবার ডেঞ্জার সাইন। ঘটনা কি ? কাছে গিয়ে বোঝা গেল এই এলাকায় মাঝে মধ্যে বন্য ভাল্লুক দেখা যায়। অতঃপর সাবধান। মানে এই এক দেড় ঘণ্টা আমরা বন্য ভাল্লুকের সাথে দেখা হওয়ার সমূহ আশঙ্কা সাথে নিয়ে অন্ধকার জঙ্গলে রাস্তা খুঁজছিলাম। ষোলকলাপূর্ণ তবে এটাকেই বলে!

লোকালয়ে যখন ফিরলাম, হাত-পা কাদা আর বালুতে মাখামাখি। আমরা পাহাড় ছেড়ে বের হয়েছি বটে কিন্তু পাহাড়ি মাটি আমাদের ছাড়েনি। রুমে যখন ফিরলাম হাত পা নাড়ানোর শক্তি আর নেই। আমার পায়ের নিচে টাইলস বসানো মেঝে, সামনে নরম বিছানা অথচ যেখানে তিনঘণ্টা আগেও জানা ছিলনা আজকের রাতটা কাটানোর জন্য একটুকরো সমতল মাটি জুটবে কিনা। জীবন কতইনা ঠুনকো, অনিশ্চয়তায় ঠাসা। অথচ এই অনিশ্চিত জীবন নিয়েই আমরা বড় ব্যস্ত। আমাদের সময় নেই। আসলে সময় কখনো ফুরায় না, আমরাই ফুরিয়ে যাই। রাতে ঘুমানোর আগে, নিজেই নিজেকে বাহবা দিলাম, 'ইভা ইউ ডিড আ গুড জব টুডে'। তারপর লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিলাম। পৃথিবীতে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারার মতো প্রশান্তি আর কোনো কিছুতে নেই।

■ *লেখক : ডিডি, এফইপিডি, প্র.কা.*

টুনটুনি, বৃষ্টি আর কাশবনের কবিতা

ফাহমিদা আয়েশা

সোমবার।
ভাদ্রের শেষ সকাল
ঘড়ির কাঁটায় সময়-
সাত কিংবা পৌনে সাত।
স্থান- নীলফামারি সৈয়দপুর রেলপথের
কাছেপিঠে কোথাও।
পত্রিকার ছাপা অক্ষরে পরিচয়-
সোনায়রার ধনীপাড়ের বউ- টুনটুনি
কোলে তিন বছরের শিশুকন্যা বৃষ্টি।

রেললাইনের সোজা পথে
বক্রজীবনের দিকভ্রান্ত গল্প হেঁটে চলে গন্তব্যহীন
অথবা নিশ্চিত গন্তব্যের পথে।
শরতের অস্ফুট নীলাভ আলোয়
বেদনার রং আরো গাঢ় লাগে
করুণ-কাতর মুখাবয়বে শুধু বিষাদের আলপনা।
চোখ থেকে সরে গেছে মায়ার ঘোর
শূন্য কোঠরে জমতে থাকে অপেক্ষার বরফ।
সন্তানকে আঁকড়ে ধরে জননীর অপেক্ষা-ট্রেন আসবে।

এর আগেও কত কেউ-অপেক্ষায় ছিল
প্ল্যাটফমে দাঁড়িয়ে-লজেন্স, পানির ফেরিওয়ালা
যাত্রী, কিংবা মুটে টানার কুলি।
সবার অপেক্ষাকে উপেক্ষা করে
কতদিন! কতদিন সময় মতো
পৌঁছেনি সর্পদীঘল বাহন!
আজ তার কিছুই ঘটলো না।
খুলনা থেকে চিলাহাটিগামী আন্তঃনগর রূপসা
ঠিক ঠিক চলে আসে!

অতঃপর
পৃথিবীর মঞ্চ থেকে মুছে গেল মমতার দৃশ্য
মায়ের আঁচল থেকে খসে গেল
শিশুর নৈস্বর্গিক হাসি, কিংবা মায়াময় চাহনি!
যে মায়ায় আকুতি ছিল,
আহ্লাদ ছিল, ছিল নিবিড় ঘন আলিঙ্গন!
সে মায়ার জালে আটকে থাকে বেদনার গভীরতর পদ্য
আর পৃথিবীর বুকে মঞ্চস্থ হয়
নিষ্ঠুরতা, নির্দয়তার মর্মবিদারক এপিক!

আহ্! বৃষ্টি, আহ্! টুনটুনি!
তোমার মৃত্যুতে জ্বলে যায় আমাজনের বুক
তোমার মৃত্যুতে শোকে বিহ্বল
বেনেবউ, হরিয়াল আর ডাহুক।
তোমার মৃত্যুতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়
মেরুর বুকের আলো
মড়ক লাগে চিরহরিতের বসতভিটায়।
পৃথিবীর অভিধানে বদলে যায় মায়ার সংজ্ঞা
ভালোবাসা থেকে উড়ে যায়
ভরসার নীলকণ্ঠ পাখি।

জানিনা কে তোমার শরতের আকাশ থেকে
লুটে নিয়ে গেছে আদিগন্ত সাদা কাশবন
কে তোমার উচ্ছ্বলতায় শেকল পড়িয়ে
টেনে নিয়ে যায় মৃত্যু অবধি!
কে থামায় বৃষ্টির রিমঝিম
সকাল ভাদরে আহেরি ভৈরব?

কখনো এসো আবার এমন ভাদরে
বেদনার নীলে সাদা মেঘের উড়ান নিয়ে
অথবা কাশবনের কবিতা হয়ে। এসো।

কবি: জেডি, ডিসিপি, প্র.কা.

রবীন্দ্রনাথ ও উপেন

কৃষ্ণা মিত্র

ঘুমঘুম চোখে ঘড়িতে দেখলাম ছ'টা বাজে
ছুটির সকাল আজ, যাবো না কোনো কাজে।
পাশ ফিরে আবার ঘুমের রাজ্যে চলে এলাম।
সন্ধ্যা নেমে এলো নির্জন নদীর তীরে একা বসে
মনভুলানো আবির রাঙা মেঘের ছায়া নদীর জলে।
হঠাৎ অনুভব করলাম পিছনে দাঁড়িয়ে কেউ
ফিরে দেখি শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত দীর্ঘঋজু কান্তি
বিশ্বকবি আমার প্রাণের কবি রবি ঠাকুর!

কবি যেন আমার কত যুগের চেনা, কত আপনজন
শুধালেন-নদীর জলে আকাশের রূপ দেখছো?
বললেন- প্রকৃতি ও মানুষকে আমি খুব ভালোবাসতাম
বাংলায় এখনো কি উপেনরা আছে? দুই বিঘার উপেন
নিরুত্তর আমি নিস্তব্ধতা ঘিরে আছে চারপাশ
বললাম, গুরুদেব আপনি বিশ্বকবি
বাংলা আপনাকে লালন করে, পালন করে ২৫ শে বৈশাখ
কবি আপনি এখনো আছেন সাদরে থাকবেন বাংলায়
কবি চলে যাচ্ছেন, বলছেন-আমি আছি, উপেনরাও যে আছে!

কবি: জেডি, ইএমডি-২, প্র.কা.

বেন্দে লাকো

প্রবাল আহমেদ

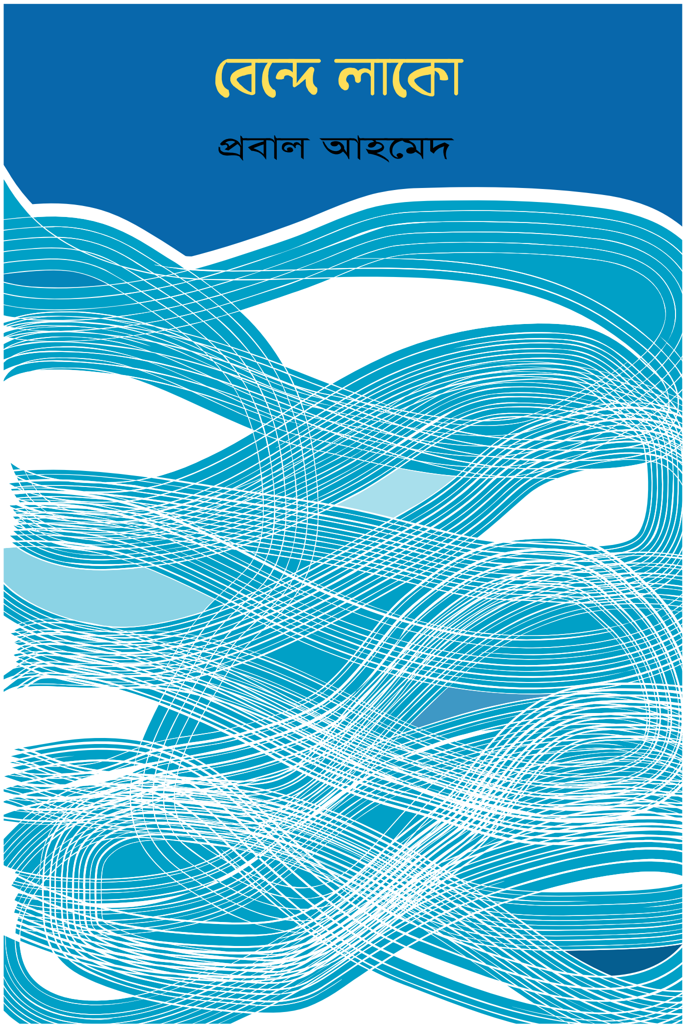

আমার কন্যার বয়স যখন আড়াই-তিন বছর তখন তার হাত থেকে ঘরের জিনিসপত্র রক্ষা করার জন্য আমাকে নানারকম কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র থেকে শুরু করে কাঁচের শোপিস পর্যন্ত, সব ধরনের জিনিসই আমার কন্যা নিজের দখলে নেয়ার চেষ্টা চালাতো এবং এই চেষ্টায় বাধা দেওয়া হলে বিকট চিৎকারে বাড়ি মাথায় তুলতো।

টেবিলে কোনো জরুরি কাগজ রাখা যেত না; এমনকি কিছুদিন আমার বই পড়া প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, কারণ, বইয়ের পাতা তার হাত থেকে রক্ষা করা একটা অত্যন্ত কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এইরকম মধুর যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে একদিন বিরক্ত হয়ে মেয়েকে বললাম - ‘ তুমি যদি আবার এরকম দুষ্টুমি করো, তাহলে কিন্তু তোমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হবে।’

বেঁধে রাখার ব্যাপারটা আমার কন্যা ঠিকমতো বুঝতে পারলো না এবং চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। শিশুদের আমরা যা বলি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা বাস্তবায়ন করি না। কিন্তু একদিন আমি সত্যি সত্যি একখানা রশি দিয়ে আমার শিশুকন্যাকে টেবিলের পায়ার সাথে বেঁধে ফেললাম। বন্দীত্ব ব্যাপারটা জগতের কোনো প্রাণীই পছন্দ করে না। মুক্তি হচ্ছে মানুষের চরম কাঙ্ক্ষিত একটি বিষয়। তবে শিশুদের মতিগতি বোঝা কঠিন। আমি তাকে শাস্তি হিসেবে বেঁধে রেখেছিলাম। কিন্তু আমার কন্যা বেঁধে রাখার ব্যাপারটাকে একটা নতুন ধরনের খেলা হিসেবে নিল। বোধহয় তার মনে হলো যে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখাটা একটা খুব মজার খেলা এবং বাবার সাথে খেলার এই সুবর্ণ সুযোগ হারানোটা উচিত হবে না।

কোমরের সাথে বেঁধে রাখা দড়িটাকে নিজের শরীরে আরেকটু ভালোমতো পেঁচিয়ে নিয়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল - ‘একন আমলা কী কলবো?’ (এখন আমরা কী করবো?) তার ভাব দেখে মনে হলো যে এই খেলার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হওয়া উচিত সে বিষয়ে সে নিশ্চিত হতে পারছে না এবং খেলাটাকে আরেকটু উপভোগ্য করে তোলার জন্য তার পিতার সাহায্য দরকার। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেলাম। একটা শাস্তি এইরকম একটা মজার খেলায় পরিণত হবে-এটা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। জগতের মহাপুরুষেরা চিরকাল মানব জাতির মুক্তির জন্য নানারকম জ্ঞানগর্ভ বাণী দিয়েছেন। কিন্তু, আমার তিন বছরের কন্যাকে দেখলে তারা নিশ্চয়ই বিভ্রান্ত হতেন এবং মানুষের মুক্তি নিয়ে ততটা উতলা হতেন না। বেঁধে রাখার ব্যাপারটা সেদিন খুব বেশি দীর্ঘস্থায়ী হলো না। কিছুক্ষণ পরই ব্যাপারটা তার মা’র নজরে পড়লো এবং আমার কন্যাকে বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করা হলো। সেই সাথে আমার আক্কেলজ্ঞান যে কত কম, সে বিষয়ে একখানা দীর্ঘ বক্তৃতা শুনতে হলো।

আমার আক্কেলজ্ঞান কম হলেও, বেঁধে রাখার এই ব্যাপারটা আমার কন্যার মাথায় ঢুকে গেল। এই চমৎকার খেলাটার পুনরাবৃত্তির জন্য সে ব্যস্ত হয়ে উঠলো এবং আমার উদ্যোগের অপেক্ষায় না থেকে নিজেই একখানা দড়ি জোগাড় করে এনে আমার কানের কাছে মিহি সুরে বলতে শুরু করলো - ‘ বেন্দে লাকো, আমাকে বেন্দে লাকো।’ (বেঁধে রাখো, আমাকে বেঁধে রাখো।)

কে জানতো যে বেঁধে রাখার ব্যাপারটা তার এত বেশি প্রিয় হয়ে উঠবে!

ব্যাপারটা এখানে শেষ হলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু খেলায় আরেকটু নতুনত্ব আনার জন্য এবার তার মনে হলো, এবার তার বাবাকেই বেঁধে রাখা উচিত। আমার কন্যা হাতে দড়ি নিয়ে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সাথে ঘোষণা করলো - ‘তোমাকে বেন্দে লাকবো।’

মানুষের কথা আর কাজের মিল থাকতে হয়। আমার কন্যাও সম্ভবত এই নীতিতেই বিশ্বাসী। সত্যি সত্যি তার হাতের দড়িটা সে আমার পায়ের সাথে পেঁচিয়ে ফেলল। আমি বাকরুদ্ধ হয়ে বসে রইলাম। শুনেছি পুলিশ চোর ধরার পর দড়ি বেঁধে নিয়ে যায়। কিন্তু, আমার কন্যা এইভাবে আমাকে বেঁধে রাখবে সেটা বিশ্বাস করা সত্যি কঠিন।

বিভিন্ন গৃহপালিত পশুকে আমরা সাধারণত দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখি। পশুরা নিশ্চয়ই বেঁধে রাখার ব্যাপারটা উপভোগ করে না। জেলখানায় অপরাধীদের বন্দী করে রাখা হয় কিন্তু তাদেরকে নিশ্চয়ই বেঁধে রাখা হয় না। বাস্তবে মানুষকে বেঁধে রাখার উদাহরণ খুব বেশি নেই। তবে আমি বুঝলাম যে দড়ি আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস এবং বেঁধে রাখাটা একটা চমৎকার খেলা।

আমি এবং আমার কন্যার জন্য এই খেলাটা কিছুদিন গভীর আনন্দের উৎস হয়েছিল। এই খেলায় খুব জটিল কোনো নিয়ম নেই - একবার সে আমাকে বেঁধে রাখতো তারপর আমি তাকে বেঁধে রাখতাম। এই খেলাটা খেলতে খেলতে এক সময় আমি আবিষ্কার করলাম যে, জীবনে আনন্দের জন্য আসলে খুব বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই। একটা মোটামুটি সাইজের দড়ি হলেই বেশ খানিকটা আনন্দময় সময় কাটানো যায়। ছোট শিশুদের কাছ থেকেও আমাদের কতকিছুই না শেখার আছে! আমার কন্যা এখন একটু বড় হয়েছে। সে এখন আর আগের মতো কোনো জিনিস নষ্ট করে না, তাকে এখন আর বেঁধে রাখারও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমি যেন এখনো কান পাতলে শুনতে পাই একটি ছোট্ট শিশু আমার কানের কাছে মিহি সুরে বলছে - ‘ বেন্দে লাকো, বাবা, আমাকে বেন্দে লাকো।’

■ *লেখক: ডিডি, এফইআইডি, প্র.কা.*

বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারে নতুন সংগ্রহ

বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারে ব্যবহারকারীদের চাহিদা মোতাবেক নিয়মিত বই/সাময়িকী/অন্যান্য পাঠ সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়। সম্প্রতি সংগৃহীত বই/সাময়িকী/অন্যান্য পাঠ সামগ্রীর একটি তালিকা পাঠকদের জ্ঞাতার্থে নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ
এস. কে. সুর চৌধুরী
বাঙ্গালি
প্রথম প্রকাশ
২০১৭

Separate Skies
by Mizanur Rahman Shelley
First edition
Academic Press and Publisher Limited
2003

The Political Economist Behind The Poet Of Politics
by Shitangshu Kumar Sur Chowdhury
First Edition
Bangali
2017

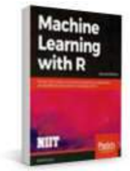

Machine Learning With R
by Brett Lantz
PACKT Publishing
2015

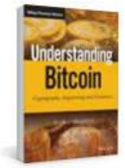

Understanding Bitcoin: Cryptography, Engineering, And Economics
by Pedro Franco
First Edition
John Wiley & Sons Ltd
2015
Format: e-book

Competition Issues In The Digital Economy
UNCTAD
2019-05
Format: Softcopy

Peer-to-Peer: P2P Lending For Beginners! How To Profit & Build Wealth With Small Loans
by Charles Zone
First Edition
Create Space Independent Publishing Platform
2016

Islamic Finance, Risk-sharing And Macroeconomic Stability
Edited by Zulkhibri, Muhamed, Abdul Manap, Turkhan Ali
Palgrave Macmillan imprint
2019, Format: e-book

Strategic Brand Management: Building, Measuring, And Managing Brand Equity
by Kevin Lane Keller
Fourth Edition
Pearson Education
2013
Format: e-book

Fundamentals Of Financial Instruments
by Sunil Parameswaran
First Edition
Wiley
2018

1971: A Global History Of The Creation Of Bangladesh
by Srinath Raghavan.
Harvard University Press
2013
Format: e-book

From Basel 1 To Basel 3:
The Integration Of State-of-the-art Risk Modeling In Banking Regulation
by Balthazar, Laurent
First Edition
Palgrave Macmillan
2006, Format: e-book

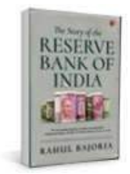

The Story Of The Reserve Bank Of India
by Rahul Bajoria
First edition
Rupa Publications India Pvt. Ltd
2018

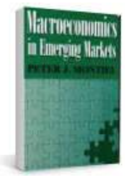

Macroeconomics In Emerging Markets
by Peter J. Montiel
Second Edition
Cambridge University Press
2011

Armstrongs Handbook Of Human Resource Management Practice
by Michael Armstrong and Stephen Taylor
Thirteen Edition
Kogan Page
2014, Format: e-book

Bank Documentation: A Practical Approach
by V.K. Arora
First Edition
Skylark Publications
2015

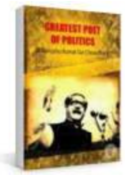

Greatest Poet Of Politics
by Shitangshu Kumar Sur Chowdhury
First Edition
Atish Dipankar Gobeshana Parishad
2017

Competition Policy For The Digital Era
European Commission
2019
Format: Softcopy

এইচআরডি-১ এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আজিজুর রহমানের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ এর সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ২৭ জুন ২০১৯ তারিখ এক বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ এর মহাব্যবস্থাপক নূর-উন-নাহারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-২ এর মহাব্যবস্থাপক কাজী এনায়েত হোসেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট ও উপহারসামগ্রী প্রদান করেন

ইএমডি-১ এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-১ এর যুগ্মপরিচালক রতন নাথ চৌধুরীর অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ২৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখ এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপমহাব্যবস্থাপক নির্মল চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক মোঃ গোলাম মোস্তফা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হাফিজ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট ও উপহারসামগ্রী প্রদান করেন

সদরঘাট অফিসে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, সদরঘাট অফিসের উপমহাব্যবস্থাপক চন্দন ভৌমিক রায় চৌধুরীর অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ৮ আগস্ট ২০১৯ তারিখ এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপমহাব্যবস্থাপক আলাউদ্দিন আল আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক এস. এম. আব্দুল হাকিম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট ও উপহারসামগ্রী প্রদান করেন

সদরঘাট অফিসে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, সদরঘাট অফিসের সিনিয়র কেয়ারটেকার মোঃ মোফাজ্জল হকের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ১৯ জুন ২০১৯ তারিখ এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপমহাব্যবস্থাপক আলাউদ্দিন আল আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক এস. এম. আব্দুল হাকিম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট ও উপহারসামগ্রী প্রদান করেন

ইডি-৩ শাখায় বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক-৩ শাখার সিনিয়র কেয়ারটেকার পরিমল হাজরার অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ২২ আগস্ট ২০১৯ তারিখ এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে নির্বাহী পরিচালক অশোক কুমার দে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহারসামগ্রী প্রদান করেন

এফআইআইডি এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক শাহ মোঃ এমরানের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ২৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখ এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহাব্যবস্থাপক এস এম রেজাউল করিম। অনুষ্ঠানে সভাপতি বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহারসামগ্রী প্রদান করেন

বগুড়া অফিসে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসের যুগ্মব্যবস্থাপক মোঃ মোকসেদুর রহমানের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ১৮ জুলাই ২০১৯ তারিখ এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুর রহমান প্রামানিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জগন্নাথ চন্দ্র ঘোষ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহারসামগ্রী প্রদান করেন

বগুড়া অফিসে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসের সিনিয়র কেয়ারটেকার এস. এম ইউসুফ আলী এবং মোঃ ইব্রাহিম শেখের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ২৫ জুন ২০১৯ তারিখ এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যুগ্মপরিচালক মোঃ শামছুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জগন্নাথ চন্দ্র ঘোষ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহারসামগ্রী প্রদান করেন

আধুনিকায়নের কাজ শুরু হয়েছিল আমাদের শেষ সময়ে। এখন তা পূর্ণতা পেয়েছে। মেধাবী তরুণদের পদচারণায় মুখরিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ব্যাংকিং সেক্টর এখন পুরোদমে ডিজিটাল। কাজের গতি ও মান বেড়েছে। অবসরে গিয়ে আমরাও এর সুবিধা ভোগ করছি।

আতিকুর রহমান
প্রাক্তন উপমহাব্যবস্থাপক

স্মৃতিময় দিনের এবারের আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের অবসরপ্রাপ্ত উপমহাব্যবস্থাপক আতিকুর রহমানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন সিলেট অফিসের যুগ্মপরিচালক মোঃ জাবেদ আহমদ। তাঁর সাথে আলাপচারিতায় উঠে এসেছে অতীত দিনের স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ।

স্যার, অবসর সময় কিভাবে কাটছে?

মানুষের জীবনটা আসলে কর্মময়। তবে চাকরি থেকে আনুষ্ঠানিক অবসরান্তে ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিবারিক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সভাপতি ও সিলেটের স্বনামধন্য এইডেড হাই স্কুলের এসএসসি ১৯৭০ ব্যাচের সংগঠন 'স্মৃতিময় ৭০' এর সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ব্যস্ততা ও আনন্দের সাথেই অবসর জীবন কাটছে। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা অবসরপ্রাপ্তরা অফিসের বরাদ্দকৃত নির্ধারিত কক্ষে বসে মতবিনিময় করি।

বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদানের অনুভূতি কেমন ছিল?

১৯৭৬ সালের ১৭ মে বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রাম অফিসে যোগদান করি। ঐদিন আমার সাথে সলিল কান্তি দত্ত এবং মনিরুল হকও যোগদান করেছিলেন। চট্টগ্রাম অফিসের তখনকার মহাব্যবস্থাপক ছিলেন মোঃ শামসুদ্দোহা। কাকতালীয় হলেও আমরা তিনজন চাকরির সায়াহ্নে এসে পুনরায় প্রধান কার্যালয়ে একত্রে কাজ করি।

কর্মজীবনে কোথায় কোথায় কাজ করেছেন?

৩৫ বছরের চাকরি জীবনের শুরুর দুই বছর চট্টগ্রামে এবং শেষ ৫/৬ বছর প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত ছিলাম। বাকি সময়টা নিজ শহর সিলেট অফিসেই কেটেছে। সিলেট অফিসে বিভিন্ন শাখা/বিভাগে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলেও বেশিরভাগ সময়ই প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। যার প্রেক্ষিতে সকলের সাথেই হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রধান কার্যালয়ে ডিবিআই, একাউন্টস বিভাগ এবং এফআরটিএমডি-তে দায়িত্ব পালন করেছি। উপমহাব্যবস্থাপক পদে কর্মরত অবস্থায় সিলেট অফিস হতে ২০১২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত অবসরে গমন করি। চাকরি জীবনে ঊর্ধ্বতন ও সহকর্মীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও ভালোবাসা পেয়েছি। অবসরে গিয়েও অনেকের সাথে আমি নিয়মিত যোগাযোগ রাখি, নম্বর না থাকায় অনেকের সাথে পারি না। আমার মোবাইল নম্বর ০১৩০৬-৬০৭৫৮৮, পরিচিতজনরা ফোন করলে কৃতার্থ হবো।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এ ভাবমূর্তি একদিনে হয়নি। এখন তা রক্ষার দায়িত্ব আপনার আমার সকলের

কর্মক্ষেত্রে বিশেষ কোনো স্মৃতির কথা বলবেন কি?

পূর্ণ কর্মজীবনই স্মৃতিময়। নিজস্ব জায়গায় সিলেট অফিসের নতুন ভবন উদ্বোধন ও ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরুর কাজে সম্পৃক্ত ছিলাম। সিলেট কো-অপারেটিভ (সিকো) পুনর্গঠন কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, সিলেট এর ম্যাগাজিন 'সুরমা' ১৯৮৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় আমার সম্পাদনায়। আমি সাহিত্য সম্পাদক পদে তিন মেয়াদে ক্লাবে দায়িত্ব পালন করি। ১৯৭০ সালে ব্যাংকের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের 'মুসলিম বয়েজ হোস্টেল' (বর্তমানে মধুবন মার্কেট) ক্রয়ের নিমিত্তে তৎকালীন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান ছয় লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়। পরবর্তীতে বরাদ্দ বাতিল হলেও টাকা আদায়ে সিলেট অফিস অনেক যোগাযোগের পর সিদ্ধান্ত হয় সরকারকে দেয় লভ্যাংশ হতে এ টাকা আদায় করা হবে। পরবর্তী সময়ে আমি প্রধান কার্যালয়ের একাউন্টস বিভাগে কর্মরত থাকাকালে ছয় লক্ষ টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করি।

ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যদি বলতেন-

স্ত্রী, এক কন্যা, স্কুল পড়ুয়া ছেলেকে নিয়ে আমার পরিবার। গ্রামের বাড়ি সিলেট সিটি কর্পোরেশন সংলগ্ন দক্ষিণ সুরমা উপজেলার বরইকান্দি গ্রামে।

আপনার সময়ের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে বর্তমান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তুলনা করুন-

চাকরি জীবনের বেশিরভাগ সময়ই আমাদের হাতেকলমে ম্যানুয়ালি কর্ম সম্পাদন করতে হয়েছে। এতে পরিশ্রম ও সময়ক্ষেপণ বেশি হতো। আধুনিকায়নের কাজ শুরু হয়েছিল আমাদের শেষ সময়ে। এখন তা পূর্ণতা পেয়েছে। মেধাবী তরুণদের পদচারণায় মুখরিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ব্যাংকিং সেক্টর এখন পুরোদমে ডিজিটাল। কাজের গতি ও মান বেড়েছে। অবসরে গিয়ে আমরাও এর সুবিধা ভোগ করছি।

নবীনদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন-

জীবনের একটি সত্য ঘটনা বলছি, প্রধান কার্যালয়ে থাকাকালে পরিদর্শন কাজে সিরাজগঞ্জ যাচ্ছিলাম। আইনশৃংখলা বাহিনী বিশেষ কারণে সারিবদ্ধ গাড়িগুলো তল্লাশি করছিল। আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচয় জানালে তারা কোনোরকম তল্লাশি ছাড়াই আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের এ ভাবমূর্তি একদিনে হয়নি। এখন তা রক্ষার দায়িত্ব আপনার আমার সকলের।

আপনার সময়ের সাথীদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন-

অবসরে যাওয়া সাথীদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। আমিও সকলের দোয়া প্রার্থী।

টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স : ফাইল ও ফোল্ডারের শৈল্পিক ব্যবহার

নাম ও আইকন ছাড়া ফাইল/ফোল্ডার সংরক্ষণ

মোঃ জাহিদুল ইসলাম জাহিদ

কম্পিউটার নিয়ে নাড়াচাড়া অথচ ফাইল/ফোল্ডার তৈরি করার প্রয়োজন হয়নি এমন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আমরা সাধারণত কম্পিউটারের কাজসমূহকে সুন্দর ও সুচারুভাবে সাজিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন নামে ফাইল ও ফোল্ডার তৈরি করি। কেউ কেউ আবার কাজের শ্রেণি বিন্যাসের জন্য সেগুলোর আইকনও পরিবর্তন করে থাকে যেন এগুলো দেখামাত্রই বিষয়বস্তু সম্পর্কে সহজেই ধারণা পাওয়া যায়। আবার আপনার কাজটি যদি অত্যন্ত গোপনীয় হয় তখন কিন্তু আপনি চাইবেন আপনার ফাইল ও ফোল্ডার যেন কেউ দেখতে বা অনুসন্ধান করতে না পারে। আপনার কম্পিউটার কিন্তু আপনাকে সে সুবিধাও দিয়ে রেখেছে। তবে সতর্ক থাকতে হবে অন্যদের থেকে লুকাতে গিয়ে নিজেই যেন তা হারিয়ে না ফেলেন।

আজকের 'টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স'-এ থাকছে নামবিহীন ফাইল ও ফোল্ডার তৈরির পদ্ধতি, আইকন পরিবর্তন এবং সর্বশেষ আমাদের তৈরিকৃত ফোল্ডারকে অদৃশ্য করে দেয়া।

নামবিহীন ফাইল ও ফোল্ডার তৈরি

এটি ডকুমেন্টসমূহ আড়াল করে রাখার জন্য একটি অত্যন্ত নিরাপদ উপায়।

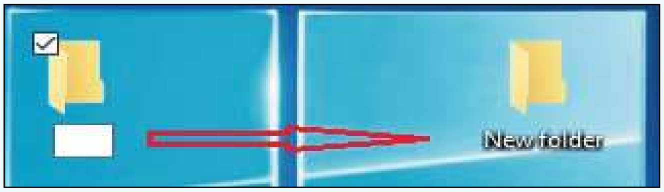

কম্পিউটারের বিধান অনুযায়ী নামকরণ করা হয়নি এমন ফোল্ডারগুলোকে অবশ্যই একটি নাম দিতে হবে নতুবা কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে 'New folder' নাম প্রদান করবে অথবা ফোল্ডারটির পূর্বে যে নামটি দেওয়া ছিল সেটিতে ফিরে যাবে। তাহলে আমরা নাম ছাড়া ফোল্ডার তৈরি করব কিভাবে? প্রযুক্তিগতভাবে সেটা সম্ভব না হলেও আপাতদৃষ্টিতে আমাদের ফাইল/ফোল্ডারকে নামবিহীনই মনে হবে।

- আপনার তৈরিকৃত ফাইল/ফোল্ডারে ক্লিক করুন এবং F2 চাপুন অথবা তার উপরে মাউস পয়েন্টার নিয়ে ডান বাটন ক্লিক করুন এবং নামটি মুছে দিন।
- তারপরে Alt কী চেপে ধরে ডান দিকের সংখ্যাসূচক(Numaric) কী-থেকে 0160 অথবা 0141 টাইপ করুন, Alt কী-টি ছেড়ে দিন এবং এন্টার চাপুন।

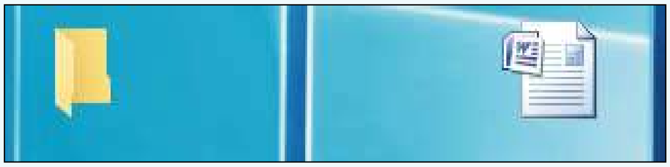

এবার লক্ষ্য করুন আপনার ফোল্ডারের নাম কি? নাম কি পড়া যায়? কোনও নাম নেই তাইতো? তাহলে আপনি প্রথম ট্রিক্সটি সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছেন। এবার দ্বিতীয় টিপস্।

ফোল্ডারের আইকন পরিবর্তন

ধরুন আপনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট স্ক্যান করে একটি ফোল্ডারে রেখেছেন। এখন আপনি চাইছেন আপনার ফোল্ডারটিও যদি দেখতে স্ক্যানারের মতো হতো তাহলে ফোল্ডারে সংরক্ষিত দলিলাদির বিষয়বস্তু সম্পর্কে সহজেই ধারণা পাওয়া যেত। সেই কাজটি করতে হবে নিম্নরূপ-

- কাঙ্ক্ষিত ফোল্ডারের উপর মাউস পয়েন্টার রেখে ডান বাটনে ক্লিক করুন।
- আগত মেন্যুর নিচের দিক থেকে Properties লেখাটি নির্বাচন করুন।
- এবার ছবির সাথে মিলিয়ে Customize Tab নির্বাচন করুন।
- Change Icon নির্বাচন করুন।
- এবার ডানে স্ক্রল করে ছবির ধাপ-৪ অনুসারে আপনার পছন্দের ছবিটি নির্বাচন করে ২টি OK বাটনেই ক্লিক করুন।

এবার লক্ষ্য করুন, আপনি যে আইকনটি পছন্দ করেছেন আপনার ফোল্ডারটি দেখতে ঠিক সেরকম হয়ে গেছে অর্থাৎ চাহিদা মোতাবেক ফোল্ডারটি দেখতে স্ক্যানারের মতো হয়ে গেছে।

ফোল্ডার অদৃশ্যকরণ

এবার আমরা দেখবো কিভাবে ফোল্ডারটিকে অদৃশ্য করে দেওয়া যায়। তবে সাবধান, অদৃশ্য করার পূর্বে কিন্তু আপনার ফোল্ডারটির ব্যাকআপ নিয়ে রাখতে হবে।

উপরের ছবির মতো করে আমরা প্রথম তিনটি ধাপ সম্পন্ন করবো। এরপর নিচের ছবিটি অনুসরণ করবো।

- ডানে-বামে প্রয়োজনমাফিক স্ক্রল করে উপরের ছবির ৪-নং ধাপের মতো করে একটি ফাঁকা আইকন নির্বাচন করুন এবং ২টি OK বাটনেই ক্লিক করুন। ফোল্ডারটির আইকন এখন দেখতে কেমন হয়েছে? ফোল্ডার কি হারিয়ে গেছে? ভয়ের কিছু নেই, হারায়নি বরং সেটি যেখানে ছিল সেখানেই আছে। একটু খুঁজে দেখুন, আশা করি পেয়ে যাবেন। যেকোনো সমস্যায় যোগাযোগের সুযোগ উন্মুক্ত।

■ *লেখক: মেইন্টিনেন্স ইঞ্জিনিয়ার*
এএন্ডবিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
Email: zahid.islam@bb.org.bd, আইপি ফোন-২১৫১১

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক জী. এম. আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই-মেইল : aziza.begum@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : জামান প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ৪১-৪২, ইসলামপুর রোড (আদিল কমপ্লেক্স), ঢাকা-১১০০।